শিক্ষা-প্রসঙ্গ—২

আধুনিক
শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

এম. এ. (লণ্ডন), এম. এ. (এড), টি. ডি. (লণ্ডন)

ডিপ্লোমা-ইন-মণ্টেসরি ট্রেণিং (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানেন্দ্রমোহন রিসার্চ্চ স্কলার, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও আগ্রা বি. আর. ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রসার বিভাগের সহ-সম্পাদক ; 'শিক্ষা ও শিক্ষানীতি', 'Society and Education', 'শিশুর জীবন ও শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

অ শো ক পু স্ত কা ল য়

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আজ চারিদিকে পরিবর্ত্তনের ঢেউ। আর সেই ঢেউ পৌঁছে গেছে শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে ও জীবনের প্রতিটি স্তরে। তাই আজ শিক্ষকের দায়িত্ব যেমন বেড়ে গেছে, তেমন অভিভাবকের ও জনসাধারণের দুশ্চিন্তার বোঝা ভারী হ'য়েছে। কি ক'রে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ঠিক পথে এগিয়ে দিয়ে বর্ত্তমান জটিল জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে তুলবেন?

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে—কোন্ পথে শিক্ষার ধারা ব'য়ে চ'লেছে, এ নিয়ে আজ অনেকের মনে সংশয় জেগেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার বর্ত্তমান রূপ কি, সেখানে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল তাই জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। তারপর প্রশ্ন জাগে কি ভাবে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঠিক পথে নির্দ্দেশ দিতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে কোন্ শাখা নিলে শিক্ষার্থী বেশী লাভবান্ হবে, তা কি ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হ'তে পারে?

আজ বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও অভিভাবকদের অজানা নেই। সন্তানদের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করা বিদ্যালয়ের পক্ষে আজ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা দিন দিন পিছিয়ে প'ড়ছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে, আছে কর্ম্মশক্তি, কেবল নির্দ্দেশ, পরিচালনা ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটছে। শিক্ষকদের অবস্থাও অনুরূপ। শিক্ষকতার আদর্শ, ত্যাগের ব্রত ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে বাস্তবের সংঘাতে। চারিদিকে কাঞ্চন-কৌলীন্য, মিথ্যা আভিজাত্যের আবরণ। শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন তাই আজ গৌণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শ্রদ্ধার অভাবে। সমাজের কাছে শিক্ষকের মর্য্যাদাও তাই দিনে দিনে ক্ষুণ্ণ হ'তে চ'লেছে।

আবার সাধারণ অভিভাবকদের দিক থেকেও জীবন-সংগ্রাম আজ এতই তীব্র হ'য়েছে যে, বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক বা উপ-শিক্ষক রাখাও সব সময় সম্ভবপর হয় না, অথচ বিদ্যালয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রলেও সুফল ফলে না। এমনি নানা জটিল সমস্যায় আজ জীবন সমাকীর্ণ।

(ক) তাই আজ স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিককে জানতে হবে শিক্ষার নবরূপ কি? বিশ্লেষণ ক'রতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রের এই নিত্য নূতন আয়োজনকে?

(খ) সচেতন হ'তে হবে তাঁদেরই স্নেহাস্পদ শিশু-কিশোর সম্পর্কে—কেন তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে বিকশিত হ'চ্ছে না, কেন তারা শ্রেণীতে পিছিয়ে প'ড়ছে?

(গ) বুঝতে হবে বিদ্যালয়ের অবস্থাকে ও বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিককে আর সম্ভবস্থলে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে এই সব উপেক্ষিত শিশু-কিশোরদের প্রকৃত শিক্ষার জন্যে।

এদেশে শিক্ষার দায়িত্ব কেবল শিক্ষকের নয়—অভিভাবক ও জনসাধারণকেও এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা ক'রতে হবে, এবং সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ ক'রতে হ'লে তাঁদের আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে।

এই গ্রন্থখানি সেই পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই নানা সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিতে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ ক'রবার প্রচেষ্টা হ'য়েছে। তা ছাড়া কালের গতির সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। তাই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনাও গ্রন্থখানির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

আজ গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠেছে নানা কারণে। তাই কি ভাবে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা যায়—কি ভাবে শিক্ষার্থীর কর্ম্ম-পঞ্জীকে (Cumulative Records) নির্ভরযোগ্য করা যায়, সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ ও বিভিন্ন নমুনাতে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

পরিশিষ্ট অংশটির মধ্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ, অধ্যবসায়, বিষয়-জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের নানা দিকে পরীক্ষার উপকরণের সন্নিবেশ করা হ'য়েছে।

আশা করি, এই প্রচেষ্টা শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে ও তাঁদের সুষ্ঠু নির্দ্দেশে ধন্য হবে। ইতি—

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পুস্তকখানি প্রণয়নে আমি অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর অনুপ্রেরণা না পেলে হয়ত পুস্তকখানি আত্ম-প্রকাশ ক'রত না। এ ছাড়া ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষা-প্রসার বিভাগের কর্তৃপক্ষ সকলের কাছেই আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার ক'রছি। তাঁদের সহযোগিতা ও নির্দ্দেশ না পেলে গ্রন্থখানি অপূর্ণ থাকত। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী

প্রথম অধ্যায়

(এক)

শিক্ষার নবরূপ

সমাজের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। আজ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থারও যেমন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তেমন শিক্ষারও সংস্কার শুরু হয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জনকল্যাণ ও সর্ব্বসাধারণকে সমান সুযোগ দেওয়াই তার ব্রত। কারণ জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হ'ল রাষ্ট্রের উন্নতি। তাই গণতন্ত্রকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানের আলোক সুদূর পল্লীপ্রান্তে পৌছে দিতে হবে, অসহায়, দীন, মূঢ় প্রাণেও আশা সঞ্চার করতে হবে।

স্বাধীনতা দেশে যুগান্তরেব স্চনা করেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা উঠেছে।

ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশই আজ শিক্ষার চরম লক্ষ্য ব'লে পরিগণিত। তাই ব্যক্তিব প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি, ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য। এক নূতন সম্ভাবনা নিয়ে এক নবযুগের যে স্চনা হযেছে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হলে চাই সেই অনুযায়ী আয়োজন।

সমাজের নবরূপ ও সমস্যাঃ

নবযুগের উন্মেষের সাথে সাথে সমাজের রূপ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। দেশেব সংস্কৃতি ও শিক্ষা আজ কেবল অনুভূতি-কেন্দ্রিকই নয়। বাস্তবের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সব কিছুই গড়ে উঠছে। দেশের শিল্প ও বিজ্ঞান আজ সভ্যতার প্রধান পরিপোষক। তাই কৃষ্টির সাথে স্বষ্টির, যন্ত্রের সাথে তন্ত্রের এক নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

আজ জীবনের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। ফলে জীবনযাত্রাও জটিল হয়েছে। তাই দেশের মাটিকে ছেড়ে কেবল কল্পনা ও অনুভূতিলোকের যাত্রী হলে আজ চলে না। চাই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। তাই শিক্ষাযন্ত্রটিকেও সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায়, নূতন পরিস্থিতিতে শিক্ষার সংস্কার অনিবার্য্য। তাই দেখা দিয়েছে দিকে দিকে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা।

শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব ঃ

শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিত্বকে খর্ব্ব ক'রে রুচি ও প্রবণতার প্রতি উদাসীন থেকে কোন সার্থক শিক্ষাই সম্ভবপর নয়। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই জন্মার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায় এক এক দিকে এক এক জনের প্রবণতা। তাই তাকে কাজে লাগানোই হ'ল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যার যেদিকে প্রবণতা সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারার জন্যে তাই নূতন আয়োজন চলেছে।

বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনা দেখা দিলেও তাকে রূপ দেওয়া সময়সাপেক্ষ। এ পর্য্যন্ত শিক্ষায় নানা কমিশন বসেছে, যেমন—রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, দে কমিশন ইত্যাদি।

তাদের উপযোগিতাও বর্ত্তমানে যথেষ্ট। প্রত্যেক কমিশনেই শিক্ষার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষাধারার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। জীবনের প্রয়োজনের দিকে ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে আজ শিক্ষার উপাদান নির্দ্ধারিত করবার প্রয়োজন। তাই পাঠ্যবিষয় ও অধ্যয়নকাল, পাঠনপদ্ধতি ও শিক্ষণের উপকরণ সব কিছুরই নূতন দৃষ্টিতে সংস্কার না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ।

শিক্ষায় অনুরাগ ও রুচির স্থান ঃ

যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার অনুরাগ ও রুচি অনুযায়ী বাস্তব জ্ঞান আহরণ করতে পারে, নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে তার আয়োজন করা হ'চ্ছে।

নূতন শিক্ষার কাঠামো ঃ

(ক) ছবছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যে শেষের এক বছরে অর্থাৎ তের বছর থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ, তার রুচি ও ব্যক্তিত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(খ) চোদ্দ বছরের পব আবও তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ চোদ্দ বছর বয়স থেকে সতের বছর বয়স পর্য্যন্ত বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধারায় যে শিক্ষাব্যবস্থা সেই শিক্ষাকে (উচ্চতর) মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হবে।

(গ) সতেব বছর বয়সের পর তিন বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—যার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে।

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ

শিক্ষার সাথে সমাজেব নিবিড আত্মীয়তা ও যোগাযোগ। তাই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার সুযোগকে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের মাঝে প্রসারিত করে দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। কেবল তাই নয়, বিদ্যালয়-পরিচালনা, ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। যাঁবাই শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ যাতে নিবিড় হয়, যাতে মানুষেব যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হয় সেজন্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

এই গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে যে শিক্ষা-পরিচালনাব যথেষ্ট সম্পর্ক আছে তা সুস্পষ্ট।

বিদ্যালয়ের পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব ঃ

আজ শিক্ষা-পরিচালনায় রাষ্ট্রকে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কিন্তু দেশের শিক্ষার প্রসারের মূলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি থাকলেও জনসাধারণের সহযোগিতা না থাকলে কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে না। তাই দেখা

যায়, বহু শিক্ষায়তনের প্রসার সম্ভবপর হয়েছে বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের প্রচেষ্টায়। তাই তাঁদের সহযোগিতার পথকে কোন মতেই রুদ্ধ করা উচিত নয়। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতিতে জনসাধারণের আসন থাকা বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে তার সমাধান খুঁজতে গেলে চাই সমবেত প্রচেষ্টা।

শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের জীবনেও গণতন্ত্রের প্রভাবকে সঞ্চারিত করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আত্মপ্রত্যয় ও নেতৃত্বের উন্মেষ সাধন করার দায়িত্ব আজ প্রধানতঃ বিদ্যালয়গুলির ওপর। তাই শ্রেণীপাঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করা চলে। তাদেরই সহযোগিতায় বিদ্যালয়-পরিবেশকে অনুকূল ক'রে তুলতে হবে। বিদ্যালয় একটি ছোটখাট সমাজের সংস্করণ, আর শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তার সভ্য—সে কথা মনে রেখে কাজে এগুতে হবে। জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেওয়াই হবে গণতন্ত্রের লক্ষ্য।

এজন্য চাই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সচ্ছন্দ যোগাযোগের ব্যবস্থা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ককে নিবিড় করতে হলে চাই এই গণতান্ত্রিক আদর্শে পূর্ণ আস্থা। মানুষের মর্য্যাদা থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না হয়, প্রত্যেক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনের পথে। সমাজচেতনা ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে জাগরূক ক'রে তোলবার দায়িত্ব নিতে হলে চাই নূতন পরিকল্পনায় বিদ্যালয়-জীবনকে পরিচালিত করা।

শিক্ষাব্যবস্থার নূতন ধারা

শিক্ষাব্যবস্থার নূতন ধারা আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষার বিবর্ত্তনের আলোচনার সার্থকতা আছে। উডের 'ডেসপ্যাচ' হয়েছিল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। শিক্ষাক্ষেত্রে সে হ'ল ঐতিহাসিক যুগ।

জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে নিবিড় করবার সংকল্প নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-অধিকর্তার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু তবুও শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত হতে পারল না। তাই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'হাণ্টর কমিশনের' নিয়োগ হ'ল। কমিশনের উদ্দেশ্য হ'ল দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ।

আজকের যে শিক্ষা-পরিকল্পনা ও বিচিত্র ধারায় শিক্ষার আয়োজন তার স্বপ্ন দেখেছিলেন হাণ্টার কমিশন। ফলে ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা ব্যাপক হয়েছিল। অবশ্য এর মূলে ছিল সাধারণের সহযোগিতা ও সরকারের প্রয়াস।

এর পরেই ১৯০২ সালে বসল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (The University Commission of 1902)। এর উদ্দেশ্য হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুত্ব আরও প্রসারিত হ'ল এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার বিস্তার ঘটল। কোন বিদ্যালয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে শিক্ষার্থী পাঠাতে না পারে সেজন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। ফলে মাধ্যশিক্ষা পরিষদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হ'ল।

কিন্তু এতে শিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধা ও অসন্তোষ দেখা দিল। ফলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসল। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না—সে সম্পর্কে চেতনা দেখা দিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়েব শিক্ষার মধ্যে একটি সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল। এই কমিশনটি 'স্যাডলার কমিশন' নামে খ্যাত।

এর প্রধান অবদান হ'ল ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালযের আওতা থেকে পৃথক্ করা ও এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকের শিক্ষণব্যবস্থা ও অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন একথা স্বীকৃত হলেও সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয়নি।

এরপরেও ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে হার্টগ কমিটি ও সাপ্রু কমিটি নিযুক্ত হয়। উভয় কমিটিই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা ও জ্ঞান-পরিবেশনের সুপারিশ করেন। ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্ট এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করে। এ যাবৎ সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনে শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়।

এখানে গণতন্ত্রের আদর্শকে কার্য্যকরী করবার উদ্দেশ্যে চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৪৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাকমিশন নামে আর একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনেও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষে স্বাধীনতালাভের পর স্বাধীন ভারতের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা যুগান্তরের সূচনা করল। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের একটি সামগ্রিক আলোচনা সম্ভবপর হয়েছে মুদালিয়র কমিশনের কল্যাণে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্য ও দৈন্য ছিল তা দূর করবার জন্যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা ও নূতন পথের নির্দেশ রয়েছে এই কমিশনের বিবরণীতে।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি ঃ

(১) প্রচলিত শিক্ষাধারার সাথে জীবনের কোন নিবিড় যোগাযোগ নেই।

(২) ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে প্রচলিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়।

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার প্রভাব বেশী হওয়ায় অভিন্ন শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ।

(৪) শিক্ষাপদ্ধতি গতানুগতিক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে অক্ষম।

(৫) শ্রেণীর আকার ও একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অসামঞ্জস হওয়ায় শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

(৬) গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ও শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যকে রূপ দিতে অক্ষম।

এই সব কথা চিন্তা ক'রে শিক্ষায় আমূল সংস্কারের যে পরিকল্পনা খাড়া করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে—

(১) শিক্ষাকে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে চরম স্বীকৃতিলাভ করেছে।

(২) ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে।

(৩) শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক তৈরী করার সঙ্কল্প রয়েছে।

(৪) শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত রুচিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ওপরে ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিত্বেব বিকাশেব প্রয়াস দেখা দিয়েছে।

(৫) বৃত্তিশিক্ষাব দিকে লক্ষ্য বেখে বিদ্যালয়েব পাঠ্যতালিকায় ব্যবস্থা করার সংকেত রয়েছে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে।

শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশঃ

সামগ্রিক জীবনেব মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বেব বিকাশ। এই সামগ্রিক পরিচয় সত্ত্বেও কয়েকটি উপাদানে ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করা যায—যেমন বুদ্ধি, বৃত্তি, আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গী, ইত্যাদি।

কেবল বুদ্ধিবৃত্তিব বিকাশই জীবনকে সার্থক কবে না—সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বেব অন্য দিকও পবিপুষ্ট হওয়া চাই। উদাহরণ-স্বরূপ, আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায়, মানসিক স্থৈর্য্য ইত্যাদি ব্যক্তিত্বসূচক গুণের কথা উল্লেখ করা যায়।

পাঠ্য-বহির্ভূক্ত কার্য্যাবলীর যথাযথ ব্যবস্থা থাকা চাই। শ্রেণী-পরিচালনার মধ্যেও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতাব অবসব দিতে হবে। তারা বিদ্যালয়কে ভালবাসতে পারে। যাতে সচ্ছন্দ প্রাণেব প্রকাশ ঘটতে পাবে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক্ অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা। অধ্যবসায় ব্যক্তিজীবনে একটি বিশেষ সম্পদ। জীবনে সাফল্যের পথে অধ্যবসায়ের মূল্য যথেষ্ট। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে অধ্যবসায়ের গুণে অনেক সময়ে অনেকে অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কি ক'রে এই বিশেষ গুণের বিকাশ সাধন করা যায়?—এই হ'ল প্রশ্ন।

বিদ্যালয়-জীবনে অধ্যাবসায়কে মূল্য দিতে হলে এমন অবকাশের প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী অধ্যবসায়েব সার্থকতা বুঝে ও তার কাজে লেগে থাকার অভ্যাস জন্মাতে পারে। সে জন্যে শিক্ষক ও বিদ্যালয কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। মোটকথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার না হলে কোন সদ্বৃত্তিরই বিকাশ হয না। তাই শিক্ষকের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। শ্রেণীর কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্রমশঃ এই গুণের অধিকারী হতে পারে শিক্ষককে সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে।

এই গুণকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে হলে বিশেষ পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থাও করা যায়। মোটকথা, কর্ম্মনিষ্ঠার অভ্যাসকে চপল শিক্ষার্থিমনে জাগিযে দিলে ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভাবনাময় হযে ওঠে।

অধ্যবসায ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্বের উপাদান আছে যেগুলির বিকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাব মধ্যে আত্মপ্রত্যয বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আত্ম-প্রত্যয়কে জাগিয়ে তুলতে হলে আত্মপ্রকাশের প্রচুব সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ ক'রে যারা লাজুক, যাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও মনে জডতা, দ্বিধা ও সংশয় প্রবল তাদেব সহানুভূতির সঙ্গে সহাযতা কবতে হবে।

যাতে বিদ্যালয়েব সমাজ-জীবনেব সাথে তাদের যোগাযোগ নিবিড হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রযোজন।

এইভাবে প্রতিটি বিদ্যালযেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আযোজন একান্ত অপবিহার্য্য। শৈশব থেকেই সুরুচি, বিনয়, আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগিযে দিতে হবে কাবণ ব্যক্তিত্বই জীবনের পরিচয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য সেদিকে নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

শিক্ষায় স্বাধীনতা ঃ

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে।

শিক্ষার একটি বিশিষ্ট সত্তা স্বীকৃত হওয়ার ফলে শিক্ষাকে আজ রাজনীতি থেকে মুক্ত ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে।

তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র গতি থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।

শিক্ষানীতির মধ্যে আজ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। শাসনশৃঙ্খলা ও পরিচালনার নীতি আজ স্বতন্ত্র। যা স্বতস্ফূর্ত্তভাবে সকলের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় তা অধিক সার্থক হয়ে ওঠে। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন সম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও বিচিত্র ধারার বিদ্যালয়

বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। ফলে নূতন ধারায় বিদ্যালযগুলির সংস্কার অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। দেশে শিল্পের প্রসার ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন দেখা দিতে বাধ্য।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশের ও সমাজের নূতন চাহিদা মেটাবার জন্যে।

শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

পুঁথিগত শিক্ষা যান্ত্রিক যুগের দাবী মেটাতে না পারায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলির উপযোগিতা আজ আমরা অনুভব করতে পারছি। গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত অগণিত কিশোর-যুবকের বেকার-জীবনের কথা চিন্তা করলে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে অসামঞ্জস্যের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ে। তাই গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা অনেক বেশী। পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা যে অধিক ফলপ্রসূ একথা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তাই সকলকেই সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার পর রুচি এবং প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা নিতে হবে—এই হ'ল নূতন ব্যবস্থা।

এখন সবচেয়ে কম কোন্ বয়সে শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও প্রবণতা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়? মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বার থেকে চোদ্দ বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুরাগ ও প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। তাই বার বছর বয়সের আগে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাধারার নির্দেশ দেওয়াও কঠিন।

তবে বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও সাধারণ কৃষ্টি ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় কিছু থাকবেই। এগুলিকে ইংরাজীতে Core Syllabus বলা হয়েছে।

এর মধ্যে তিনটি পর্য্যায় আছে:

(১) ভাষা

(২) (ক) সমাজবিজ্ঞান (Social Studies); (খ) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত;

(৩) হাতের কাজ।

(১) ভাষা:

মাতৃভাষা ছাড়াও অন্ততঃ আরও যে-কোন দুইটি ভাষা শিখতে হবে।

এর মধ্যে ভারতীয়, ইউরোপীয় ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা নেওয়া যেতে পারে।

(২) (ক) সমাজবিজ্ঞান:

'সমাজবিজ্ঞান' বলতে কেবল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি বা পৌর-বিজ্ঞানের সমাবেশকেই বোঝায় না। মানুষ ও পরিবেশের মাঝে যে যোগসূত্র তাকে উপলব্ধি করাই এই বিষয়পঠনের উদ্দেশ্য।

(খ) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত:

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে ও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কাজে লাগাবার জন্যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা পরিবেশন করাই এর উদ্দেশ্য। সেইরূপ সাধারণ গণিতের মধ্যে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, সংখ্যাবিজ্ঞান, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) হাতের কাজ ঃ

এছাড়া হাতের কাজের মধ্যে, কাঠের কাজ, তাঁত-বোনা, ধাতুর কাজ, দর্জ্জির কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহলে দেখা যায়—প্রত্যেককেই আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে তিনটি ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত এবং একটি হাতের কাজ নিতে হবে।

মোট ছয়টি বিষয় আবশ্যিক (Core Curriculum) হিসাবে সকলকেই নিতে হবে ও তারপর রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী নীচের বিষয়গুলি থেকে যে-কোন একটি নির্ব্বাচন করতে হবে। সেই একটির অধীনে যে যে পাঠ্যবস্তু আছে তা থেকেও অন্ততঃ তিনটি নির্ব্বাচন করতে হবে।

(১) কৃষ্টিকেন্দ্রিক বিষয় ঃ

এর মধ্যে থাকবে—(ক) সংস্কৃত বা আরবী বা পারসী ; (খ) ইতিহাস ; (গ) ভূগোল ; (ঘ) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ; (ঙ) মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র ; (চ) অঙ্ক ; (ছ) গৃহবিজ্ঞান ; (জ) সঙ্গীত (যন্ত্র ও কণ্ঠ)।

(২) বিজ্ঞান ঃ

(ক) পদার্থবিজ্ঞান ; (খ) রসায়নবিজ্ঞান ; (গ) জীববিজ্ঞান ; (ঘ) গণিত ; (ঙ) শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য ; (চ) গৃহবিজ্ঞান।

(৩) যন্ত্রশিল্প ঃ

(ক) ফলিত গণিত ও বিজ্ঞান ; (খ) জ্যামিতিগত ও যান্ত্রিক অঙ্কন ; (গ) যন্ত্রবিজ্ঞান বা তড়িৎবিজ্ঞান, গৃহাদি নির্ম্মাণশিল্প, বা বেতারবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটি।

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক ঃ

(ক) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিজ্ঞান ; (খ) হিসাব-সংরক্ষণ ; (গ) বাণিজ্যিক ভূগোল বা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বা সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং।

(৫) কৃষিবিজ্ঞান ঃ

(ক) সাধারণ চাষের জ্ঞান (বীজ ও গাছের) ; (খ) পশুপালন ও বর্দ্ধন ; (গ) বাগান করা বা পশু-সংরক্ষণ ; (ঘ) উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব।

(৬) চারুকলা :

(ক) অঙ্কন ও রঞ্জন ; (খ) ভাস্কর্য্য ও কারুশিল্প ; (গ) যন্ত্রসঙ্গীত ; (ঘ) কণ্ঠসঙ্গীত ; (ঙ) নৃত্যকলা।

(৭) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ঃ

(ক) গার্হস্থ্য অর্থনীতি ; (খ) খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী ; (গ) মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন.; (ঘ) শুশ্রূষাসম্পর্কে শিক্ষা।

উপরি-উক্ত বিচিত্র শিক্ষার ধারা শিক্ষার্থীর রুচি ও সমাজের প্রয়োজনকে কেন্দ্র ক'রে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

এই নূতন বিচিত্র ধারার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের মূল্য দেওয়া হবে। এতদিন যে জাতির প্রাণশক্তির অপচয় হচ্ছিল তার পথ রুদ্ধ করবার জন্যে এই প্রয়াস।

কি ক'রে এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা-পরিবেশন সম্ভবপর তা পরে আলোচ্য। তবে এর জন্যে নানা রকমের বিদ্যালয়ের একে একে প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সব বিদ্যালয়গুলিকে ভিন্ন শাখার (Multilateral School) বিদ্যালয় বলা হবে।

ভিন্ন শাখার বিদ্যালয় (Multilateral School) কাকে বলে ?

অনেক বিদ্যালয়ে চোদ্দ বছর বয়সের পর ভাবী জীবনের প্রস্তুতির জন্য বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে। একই বাড়ীতে যদি রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বিচিত্র শিক্ষাধারার ব্যবস্থা থাকে তবে সেই বিদ্যালয়কে ইংরাজীতে Multilateral School বলা হয়েছে। আর যদি একই বিদ্যালয়ের মধ্যে বিচিত্র ধারার ব্যবস্থা না থাকে তবে তাকে ইংরাজীতে Comprehensive School বলা যেতে পারে। যে বিদ্যালয়ে ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন রুচি শিক্ষার্থীর ভাবের আদান-প্রদানে মুখর হয়ে ওঠে, যে প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীর জন্যে একই পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যা ভাবের সংহতিতে সমৃদ্ধ তাকে

ইংরাজীতে comprehensive বা সাধারণ বিদ্যালয় বলা হয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ের সুবিধাসম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সব বিদ্যালয়ই যদি একই ছাঁচে গড়া হয়, যদি ব্যক্তিগত পার্থক্যের কোন মূল্যই দেওয়া না হয় তবে বর্ত্তমান যুগে সে বিদ্যালয়ের বাস্তব উপযোগিতা-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকবেই।

এই প্রসঙ্গে বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামার, টেক্‌নিকাল ও মডার্ণ এই তিনটি ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে প্রচলিত হওয়ার পর আজ আবার তার সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে—আলাদা বাড়ীতে এক এক ধারায় এক এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা আজ ত্রুটিপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন। ফলে, প্রত্যেক শাখার মধ্যে, প্রত্যেক ধারার মধ্যে একটি সংহতির প্রশ্ন উঠেছে। তাই আমাদের এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দেবার সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

বিভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তনের পথে বিভিন্ন সমস্যা

যে-কোন নূতন ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনেব পথে যে বিভিন্ন বাধা দেখা দেয় তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হ'ল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা।

সমস্যাগুলিকে নিম্নলিখিত পর্য্যাযে ভাগ করা যায় :—

(১) পবিচালনামূলক ; (২) অর্থনৈতিক ; (৩) শিক্ষকসমস্যা ; (৪) মনস্তাত্ত্বিক ; (৫) পাঠ্যসূচী-নির্দ্ধারণের সমস্যা।

নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দিতে গেলে অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যে প্রবল হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কারণ, ধ্রুবকে ত্যাগ ক'রে অধ্রুবকে গ্রহণ কবাব পথে সংশয় আসবেই। তবে আশার কথা এই যে, সংস্কারের প্রয়োজন-সম্পর্কে চেতনা ও নির্দ্দেশ শিক্ষকগণেব ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা এই নূতন পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে।

তাই বর্ত্তমানে সব কিছুই পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ক্রমশঃ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তার পরিমার্জ্জন করাই শ্রেয় হবে।

সমস্যার স্বরূপ

(১) পরিচালনামূলক সমস্যা ঃ

সমস্যার সমাধান নির্ভর করে শিক্ষার পরিচালনার ওপর। কারণ, কেবল আয়োজন ও উপকরণ থাকলেই কোন পরিকল্পনার সার্থকতা আসে না। তাই পরিচালনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা স্বাভাবিক। পরিচালনাকে কেন্দ্র ক'রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হ'ল ঃ—

(১) বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির রূপান্তর-সাধন বা সংস্কারের ফলে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের পরিণতি ও নূতন সমস্যা।

(২) ভিন্ন শাখার বিদ্যালয় ও গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র-স্থাপন।

(৩) বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন ও নির্দ্দেশ।

(৪) বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন।

(৫) বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংহতিস্থাপন ও সুসমঞ্জস কর্ম্মসূচী-নির্দ্ধারণ।

(৬) ভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থি-নির্ব্বাচন।

একমাত্র পরিচালনাকে কেন্দ্র ক'রেই এরূপ বহু সমস্যা দেখা দেবে।

(২) অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে তাদের উপযুক্ত গৃহ-পরিবেশ, যন্ত্রপাতি ও আয়োজনে সজ্জিত করা ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি ধারাকেই প্রবর্ত্তিত করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন, কোন বিদ্যালয়ে বা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হবে। অবশ্য আঞ্চলিক প্রয়োজন বুঝে এই ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট হবে। ফলে হয়তো এক একটি বিদ্যালযে গড়ে ২টির বেশী বিষয় (Course) সংশ্লিষ্ট করা সম্ভবপর হবে না। আগামী দুই বৎসরে এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকার প্রয়োজন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই গুরুভার বহন করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তবে দেশের এই

দুর্দিনে শিক্ষার জন্য এই বিরাট যজ্ঞ তখনই সার্থক হবে যদি এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সার্থক হ'য়ে উঠে ও সমগ্র দেশবাসী এর সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৩) শিক্ষকসমস্যা ঃ

আজকে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে।

যাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না সেই মানবিক শক্তি সেই জনসম্পদকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। তাই উপযুক্ত শিক্ষককে আকৃষ্ট করতে হবে ও তাদের যথাযোগ্য শিক্ষা, আলোচনা ও পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষককে দেশে ও সমাজে উচ্চ আসন ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও মর্য্যাদা দিতে হবে। তা না হলে সব প্রচেষ্টাই বিফল হবার সম্ভাবনা।

নূতন পরিকল্পনার মধ্যে যেসব বিষয় প্রবর্ত্তিত হবে তার উপযুক্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব। শুধু তাই নয়, এই সব ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে যিনি অধ্যক্ষ হবেন তাঁকেও বিশেষ দক্ষ ও কৃতী হতে হবে।

পরিচালন-ক্ষমতা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তাঁরা তাঁদের ওপর ন্যস্ত কাজের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ঃ

সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রধানতম সমস্যা হ'ল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। মনের কোণেই ভিড় ক'রে থাকে বহু জটিল সমস্যা।

আজ শিক্ষকদের মধ্যে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে তাকে দূর করতে হবে। শিক্ষকই বাণীতীর্থের অন্তরাত্মা। তাই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিকতার স্পর্শ ছাড়া শিক্ষার্থিজীবনের উন্মেষ অসম্ভব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কবিভ্রাট তার অন্যতম কারণ।

এছাড়া বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা কখনই সার্থক হতে পারে না, যদি না শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকে।

বিশেষ ক'রে অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থার নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হতে পারে না। অভিভাবকরা যদি শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রবণতার দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল নিজেদের ইচ্ছা ও ধারণাকে উচ্চ স্থান দেন তবে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের উপদেশ নির্দ্দেশ সবই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হ'ল শিক্ষার্থীকে ও তার পরিবেশকে নিয়ে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুযায়ী চোদ্দ বছর বয়সেই শিক্ষার্থীর রুচি ও শক্তি নির্দ্ধারিত হবে এবং তারপর সেই অনুযায়ী বিষয়ধারা নির্ব্বাচন করা হবে।

এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে একটি বিরাট অনুমান রয়েছে—তা হ'ল চোদ্দ বছর বয়সেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিষয়ানুরাগ ও ব্যক্তিত্বের উপাদান দানা বাঁধে। সত্যই ভারতীয় পরিবেশে এই অনুমান সত্য কি-না তা গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে যতদূর মনে হয় এই বয়সেই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি সংহত হতে শুরু করে। মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টে একই কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায়।

(৫) পাঠ্যসূচী-নির্দ্ধারণের সমস্যা ঃ

প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠ্যস্থচীর ব্যবস্থা হবে।

All India Council for Secondary Education সম্প্রতি একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যস্থচী প্রকাশিত ক'রে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাই পাঠ্যস্থচীর বিস্তৃত বিবরণী এই পুস্তিকায় দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না। তবে বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, মুদালিয়র কমিশনের প্রস্তাবিত পাঠ্যস্থচী থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত পাঠ্যস্থচী স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। অবশ্য পাঠ্যস্থচীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

পাঠ্যস্থচী লক্ষ্য করলে দেখা যায় কয়েকটি বিষয়ে পাঠ্যস্থচী ত্রুটি-মুক্ত নয়। যেমন—

প্রস্তাবিত ইংরাজীর পাঠ্যতালিকা (নবম, দশম, একাদশ শ্রেণীর জন্য) যথেষ্ট বলে মনে হয় না, কারণ এই প্রস্তুতি নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি ক্লাসে

ভর্ত্তি হওয়ার কথা ; কিন্তু যে যে বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে সেই প্রস্তুতি নিয়ে সাহিত্য ও যে-কোন যান্ত্রিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করা দুষ্কর। সেজন্যে ইংরাজীর পাঠ্যবিষয়কে আরও বৈচিত্র্যময় ও পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন।

সেইরূপ Social Studies-এর যে পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত হয়েছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে সন্দেহ নেই—কিন্তু বিষয়-পরিসর দেখে মনে হয় যে, এই ব্যাপক পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এই বিষয়টি পডানোর উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও প্রথমে কঠিন হবে। কিন্তু তাহ'লেও ইতিহাস, ভূগোল পৃথক পৃথকভাবে পড়ানোর চেয়ে এর মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব উপযোগিতা বেশী কি-না বিচার্য্য।

সেইরূপ General Science-এর যে পাঠ্যসূচী তার উপযোগিতা থাকলেও বিষয়টি পডাবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাসরঞ্জাম খুব কম বিদ্যালয়েই সুলভ হবে।

ভাষাকে নিযে যে সমস্যার আজ উদ্ভব হযেছে তা-ও আরো জটিল। একজন শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীর স্তরে ৬টি আবশ্যিক বিষয় শিখতে হবে এবং তারপর যে-কোন একটি বিষযধারা নির্ব্বাচন ক'রতে হবে। আবশ্যিক বিষয়গুলির মধ্যেও দেখা যায যে, অন্ততঃ তিনটি ভাষা একজনকে শিখতে হচ্ছে। এতগুলি ভাষা একসঙ্গে আযত্ত করা কতদূব সম্ভবপর হবে সে কথাও বিবেচ্য।

পর্য্যালোচনা ঃ

আজ বিভিন্ন ধারায শিক্ষার এই আযোজন সার্থক হবে, যদি দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শেব পূর্ণ রূপাযণ ঘটে।

যে সব গ্রামাঞ্চলে বেশীর ভাগ অধিবাসী দীন, সর্ব্বহারা তাদের কাছে সবচেযে বড প্রযোজন—অবৈতনিক শিক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, তাদের জীবনমানের সঙ্গেও এই পরিকল্পনার সার্থকতার প্রশ্ন জডিত। যারা ভাবী নাগরিক তারা যদি অর্দ্ধভুক্ত থাকে, পারিবারিক জীবনে অসুখী হয়, তবে তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ কিভাবে সম্ভবপর হবে ?

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি সমাজের মূল্যের ওপরও এই নূতন পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে।

(চ) পাঠ্যতালিকার ত্রুটি এবং দৈন্ত এই সমস্যার জন্যে আংশিক দায়ী। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত ও আবেগাত্মক প্রয়োজন মেটাতে বর্তমান পাঠ্যসূচী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষম। তাই পাঠ্যসূচীকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলবার প্রয়োজনবোধে জীবনে শৃঙ্খলার মূল্য তারা বুঝতে শেখে; ফলে বিশৃঙ্খলার অবকাশ কমে যায়। শিক্ষার্থীর অনুরাগ, রুচিপ্রবণতাকে মর্য্যাদা না দিলে রুদ্ধ প্রাণশক্তি ও আবেগ অনেক সময় অবাঞ্ছিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করে ও ফলে এই সব সমস্যা দেখা দেয়। এইজন্য আজ পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন উঠেছে। কেবল তাই নয়, যাতে জীবনে শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা ও সমাজ-চেতনার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়, সেদিকেও পাঠ্যসূচীর দায়িত্ব আছে। তাই পাঠ্য-পুস্তক এমনভাবে লিখিত হওয়া উচিত যে, তার মাধ্যমে এই শিক্ষালাভ সম্ভবপর হয়। তাই পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমাজ-চেতনা ও নাগরিক শিক্ষার বিশেষ স্থান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(ছ) কিন্তু কেবল পাঠ্যসূচীর সংস্কারেই এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নয়। সামগ্রিক বিদ্যালয়-জীবনের সাথে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। কারণ শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বিভিন্ন খাতে বইয়ে দিতে না পারলে এই সমস্যা বেশী প্রকট হ'য়ে ওঠে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়েই বৈচিত্র্যময় সৃজনাত্মক কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক, হাতের কাজ, শ্রেণী-পরিচালনা, পত্রিকা-প্রকাশ, খেলাধূলা, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মসূচী বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে, শিক্ষার্থীরাও যে যার রুচি অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারে। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও সহজ হয় এবং শিক্ষকের পক্ষেও তাদের ব্যক্তিত্বকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ হয়। প্রত্যেকের মধ্যেই যে সৃজনাত্মক প্রবৃত্তি আছে তাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ ক'রতে পারলে শিক্ষার্থী প্রচুর আনন্দ পায় ও তাদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা জেগে ওঠে। শিক্ষক যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রতে পারেন তবেই সম্ভব হবে এই বিরাট সমস্যার আংশিক সমাধান। কারণ শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজনেতা ও শিক্ষাধিনায়ক প্রত্যেকের সংহত প্রয়াস ছাড়া এই বিশৃঙ্খল অবস্থার উন্নতি-সাধন সুদূরপরাহত হবে।

(জ) নীতি-প্রচারের মনোভাবই বিশৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ ব'লে মনে হয়। আজ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধর্ম্ম ও নীতি ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। শিক্ষায়তনে ধর্ম্ম আলোচনার আজ আর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে যে নীতি-শিক্ষা সহজ হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার প্রযোজন সম্পর্কে আবার প্রশ্ন জেগেছে। তাছাড়া, মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের 'স্মরণিকা উৎসব' পালন ক'রে তাঁদের পবিত্র জীবনী আলোচনা ক'রলেও শিক্ষার্থি-মনের উৎকর্ষ ঘটে।

মোট কথা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ যতদিন নিবিড় না হ'চ্ছে, যতদিন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থি-সমাজের শ্রদ্ধা ফিরে না আসছে, ততদিন এ সমস্যার পুর্ণসমাধান সম্ভবপর নয়।

পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সমস্যা

গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতি আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রশ্নকে প্রকট ক'রে তুলেছে। সে প্রশ্ন হ'ল, সত্যকারের পরীক্ষা-পদ্ধতি কি হওয়া উচিত? এই প্রশ্ন থেকেই মনে হয় যে, গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রতি সংশয় জেগেছে। অনেকেরই মতে, শিক্ষার্থীর সত্যকারের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান নাকি বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে ধরা পড়ে না। ফলে পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে বিষয়-বস্তুকে ঠিকভাবে না বুঝেই তা মুখস্থ ক'রবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। জীবনের সাথে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির যোগাযোগ কি, তা বুঝবার প্রয়োজনকে বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি নাকি মূল্য দেয় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি ও মতামতের মুল্য নাকি অনেকখানি। তার জন্যে একই পরীক্ষার্থীর উত্তর-পত্রের বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। পরীক্ষকদের এই ব্যক্তিগত মতামতের অবকাশ যে পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট, তার কার্য্যকারিতা সম্পর্কেও সন্দিহান হ'তে হয়।

পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন ক'রবার পক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন এসে ভিড় করে:—

(ক) পরীক্ষা-পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

(খ) কি ভাবে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া হবে ?

(গ) কি উপায়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ?

পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে তার কারণ হ'ল, বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তোষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-বিকাশ। সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ও ক্রম-পরিণতির সন্ধান নেওয়া পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আছে—

(১) স্মৃতি ও এমন কি নিরর্থক স্মৃতি প্রয়োগের প্রাধান্য।

(২) নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের উপর ভিত্তি।

(৩) পরীক্ষার্থীর সারা বৎসরের শ্রেণীর কাজ ও বিদ্যালয়-জীবনে অংশ গ্রহণেব উপর যথাযথ মূল্যের অভাব।

(৪) পাঠ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টির অভাব।

এগুলি ছাড়া পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের প্রভাব এই গতানুগতিক পরীক্ষা-প্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এজন্যে অনেকে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রবর্ত্তনকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করেন। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাও (objective test) ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ এই পরীক্ষায় কল্পনা, অনুভূতি, ভাব-সংহতি ও প্রকাশের ক্ষমতাকে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করা সহজ নয়। এজন্যে অনেকে মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ও প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতিতে সার্থকতা থাকলেও তার কিছু কিছু সংস্কার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, প্রশ্নগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও নির্দ্দিষ্ট ক'রতে হবে—যাতে পাঠ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন হ'তে পারে ও প্রশ্নের সংখ্যা বেশী হ'তে পারে। ফলে কোন প্রশ্নের উত্তর ক রতে বেশী সময় লাগবে না।

দ্বিতীয়ত প রীক্ষা কেবল নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে উভয়ের উপর নির্ভর ক'রেই হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার্থীর শ্রেণীর প্রাত্যহিক কাজ, বিদ্যালযের ক্রিয়াকলাপ, আচরণ সব-কিছুর ওপর ভিত্তি ক'রেই পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এজন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কার্য্য, শ্রেণীতে আচরণ, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের একটি তালিকা লিপিবদ্ধভাবে থাকার

প্রয়োজন। এ-কে ইংরাজীতে Cumulative Record Card বলা হয়। এর একটি নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হ'ল ; কিভাবে এই card ক্রমশঃ গ'ড়ে তুলতে হবে ও কিভাবে তাকে ভিত্তি ক'রে কোন্ শিক্ষার্থী সম্পর্কে কিরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব তা পরে আলোচিত হবে। মোট কথা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে নির্ভরযোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে তার সমগ্র বৎসরের কৃতিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপকে গ'ড়ে নিতে হবে।

এখন কিভাবে পরীক্ষায় নম্বর বণ্টন ক'রলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে ? একথা আজ স্বীকৃত হ'য়েছে যে, বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের আবশ্যক।

তার মধ্যে থাকবে—

প্রচলিত প্রবন্ধ-ধর্ম্মী (Essay type) পরীক্ষা।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা।

শ্রেণীর কার্য্য-কলাপ।

তাই অনেকেই মনে করেন যে, নীচের শ্রেণীগুলিতে (অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত) নিম্নলিখিতভাবে নম্বর বণ্টন করা যেতে পারে :—

প্রচলিত পরীক্ষা—	৫০ নম্বর।
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা—	৩০ নম্বর।
শ্রেণীর কাজ—	২০ নম্বর।

উচ্চ শ্রেণীতে অবশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষার নম্বর বণ্টন করা যেতে পারে :—

প্রচলিত প্রবন্ধ-ধর্ম্মী পরীক্ষা—	৬০ নম্বর।
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা—	২০ নম্বর।
শ্রেণীর কাজ—	২০ নম্বর।

প্রত্যেক পরীক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র হবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার জন্যে পাশের নম্বর নির্দ্দিষ্ট থাকবে। এমন কি শ্রেণীর কাজের জন্যেও একটি নির্দ্দিষ্ট নম্বর না পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব'লে স্বীকৃত হবে না। মোট কথা পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়। পাঠান্তে সাধারণ-পরীক্ষার প্রয়োজন থাকলেও তার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়। এজন্যে

কিছুদিন অন্তর শ্রেণী-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ক্রমশঃ শ্রেণীর পরীক্ষার ফল ও সম্বৎসরের কাজের ওপরই জোর দিতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয়ের অবকাশ মিলতে পারে। মোট কথা নীচের কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার সংস্কার হওয়া উচিত :—

(ক) ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা।

(খ) ছাত্রেরা অধীত বিদ্যার কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে।

(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রের আয়ত্ত জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষমতা।

পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে সমস্যা

আজ পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে যে সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে তা ক্রমশই ব্যাপক রূপ গ্রহণ ক'রছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই তাই এসম্পর্কে চেতনা দেখা দিয়েছে। কারণ প্রতিটি শ্রেণীতে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

সমস্যার সমাধান খুঁজতে হ'লে—তার স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণের সার্থকতা আছে।

পিছিয়ে-পড়া ছেলে কাদের বলা হবে প্রথমেই এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন। অবশ্য এবিষয়ে কোন স্থির মীমাংসা হয়নি। তবে সিরিলবার্টের মত মনস্তাত্ত্বিকের মতে তাকেই পিছিয়ে-পড়া বলা চলে যে তার নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গেও ধাপ রেখে চ'লতে পারে না অর্থাৎ কেউ যদি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হ'য়েও সপ্তম শ্রেণীর মান অনুযায়ী কাজ ক'রতে না পারে, তাকেই পিছিয়ে-পড়া ছেলে বলা যেতে পারে।

নানা কারণে এই পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। নানারকম পিছিয়ে-পড়া দেখা গেলেও শিক্ষাক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে-পড়া তাদের নিয়েই প্রথমে আলোচনার অবকাশ আছে।

কি কি কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে?

যে কারণগুলি পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল—

(১) প্রতিকূল পরিবেশ,

(২) আবেগ-উচ্ছ্বাসজনিত অসুবিধা ও

(৩) জন্মার্জ্জিত কায়িক ও মানসিক ত্রুটি।

এছাড়াও অল্পবুদ্ধি ও জন্মার্জ্জিত ব্যক্তিগত ত্রুটিও এর মূল কারণ হ'তে পারে। বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে ক্রমশঃ প্রবল হ'চ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় যে, অনেক বিদ্যালযেই প্রথম ভর্ত্তির সময় শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রেণী নির্ব্বাচন করা সম্ভবপর হয না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীতে উন্নযনের সময়ও অনেক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও পরীক্ষার ফলাফলকে উপেক্ষা ক'রেই অভিভাবকদের অনুরোধ রক্ষা ক'রতে হয। ফলে এই সমস্যার সমাধান সুদূবপরাহত হয়। তাই এই দুইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবার একান্ত প্রযোজন।

সাধাবণতঃ শিশুব পাঠে অনুরাগেব অভাব ও অমনোযোগ এই সমস্যাকে ক্রমশঃ জটিল ক'বে তোলে। তাছাডা বিদ্যালযে অনুপস্থিতি, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও প্রতিকূল পরিবেশ এই সমস্যার জন্যে দায়ী। তাই যদি শ্রেণী-পাঠন বিশেষ কার্য্যকবী হয় ও পিছিযে-পডা ছেলেদেব প্রতি বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয, তবে এই সমস্যাব আংশিক সমাধান হ'তে পাবে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষার্থি-সংখ্যা এত বেশী যে, শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওযা শ্রেণীব মধ্যে সম্ভবপব নয। অনেক সময বুদ্ধিহীনতা, অসংহত আবেগ-উচ্ছ্বাস ও চিত্ত-বিকৃতি এই সমস্যাব মূল কাবণরূপে দেখা দেয। তাই কোন্ কারণে কোন্ শিক্ষার্থী পিছিযে প'ডছে তা বিশ্লেষণ ক'ববার প্রযোজন।

সাধাবণতঃ কযেকটি শ্রেণী-পবীক্ষার ফলাফল দেখে পিছিয়ে-পড়ার দল নির্ব্বাচন কবা হয। কিন্তু পবীক্ষা-পদ্ধতি যতক্ষণ ত্রুটিমুক্ত হ'তে না পারছে ততক্ষণ এই সমস্যা-নিরূপণে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

কারণ-বিশ্লেষণের উপায়ঃ

(ক) পর্য্যবেক্ষণ,

(খ) অভীক্ষা-প্রয়োগ ও

(গ) তথ্য-সংগ্রহের অন্যান্য উপায়।

শ্রেণীতে, গৃহে ও অন্যান্য পরিবেশে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য ক'রলে তার ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি একে একে ধরা পড়ে। তাই এ বিষয়ে শিক্ষকের ও অভিভাবকেব সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

পর্য্যবেক্ষণ ঃ

শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রতে হ'লে শিক্ষার্থীর আচরণ ও কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করাই হবে কারণ-বিশ্লেষণের প্রধান উপায়। বাড়ীতে অধিকাংশ সময় সে কিভাবে কাটায়, কোন্ কোন্ কাজ ক'রতে সে ভালোবাসে, তার কাজে অধ্যবসায় বা আত্ম-প্রত্যয প্রকাশ পায কিনা—এই সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেবল তাই নয, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সহানুভূতির সঙ্গে আপনার ক'রে নিতে হবে। তাদের দিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই তাদের সমস্যা, দুর্ব্বলতা, অসুবিধা, গুণাগুণ বেশী ক'রে ধরা প'ড়বে।

অভীক্ষা ঃ

অভীক্ষা ও নানারকম মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological test) আজ শিক্ষাজগতে অপরিহার্য্য হ'যে দাঁড়িযেছে। কার কি কারণে কোন্ বিষয়ে দুর্ব্বলতা তা ধরা সহজ হয় এই অভীক্ষার কল্যাণে। কাব বুদ্ধি কত, ব্যক্তিত্বের কোন্ উপাদান কার মধ্যে কতটুকু আছে বা নেই, কোন্ বিষযের কোন্ ক্ষেত্রে একজন দুর্ব্বল বা বিশেস অনুবাগী—সব-কিছুব ধারণা স্পষ্ট হয এই অভীক্ষার ফলে।

যেমন কাবও মধ্যে অধ্যবসাযেব ও আত্ম-প্রত্যযের অভাব, আবার কারও বা চিন্তাধারায় ক্ষিপ্রতাব অভাবের জন্যে অসাফল্য আসতে পারে। তাই অনেক সময়েই এই সমস্যাব সমাধানের জন্যে অভীক্ষার সাহায্যে প্রথমেই জন্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা দেখে নিয়ে তার পরে অন্যান্য কারণ নির্দ্ধারণ ক'রে নেওয়া সুবিধাজনক হয। এই সব অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্ট অংশে দেওযা হবে।

অন্যান্য উপায় ঃ

শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশকে নিবিড়ভাবে জানবারও বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ গৃহ ও পরিবেশ না জানলে শিক্ষার্থি-জীবনের অনেকখানিই অজানা র'যে যায। তাদের গৃহে পিতামাতা বা অভিভাবকের ব্যবহার, বাড়ীর বাইরে

সঙ্গীসাথীদের প্রভাব অনেক সময় কোন শিক্ষার্থীর পিছিয়ে-পড়ার কারণ হয়। তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখে নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করার বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্যে অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রয়োজনস্থলে সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকেও তথ্য আহরণ ক'রতে হবে। অবশ্য তথ্য আহরণের জন্যে অভিভাবক ও শিক্ষককে বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। কারণ কোন শিক্ষার্থীর কোন গুণাগুণ বিচার ক'রতে গেলে তাকে নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে হবে ও প্রয়োজনবিশেষে তার সাথে আলাপ ও সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন।

সমস্যার সমাধানের জন্যে কারণ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি :—

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন। কার মধ্যে কোন্ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাবে পরীক্ষায় সাফল্য আসছে না। দৈহিক বা শারীরিক কোন অক্ষমতা থাকলে তা-ও পরীক্ষা করার সার্থকতা আছে। কারণ অনেক সময় শীর্ণ দৃষ্টিশক্তি, বধিরতা, তোতলামি, হাতের আড়ষ্টতা প্রভৃতি কায়িক ত্রুটি অসাফল্যের মূল কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

সমাধানের উপায়ঃ

শিক্ষার্থীর দুর্ব্বলতা জানবার পর তার সমাধান খুঁজতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের প্রথম উপায় হ'ল শ্রেণী-পাঠনকে আরও ফলপ্রসূ ক'রে তোলা। কিন্তু তার জন্যে পাঠনের উপকরণ ও পদ্ধতি আরও বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরস হ'য়ে ওঠে, সেজন্যে শিক্ষককে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ক'রতে হবে। তাঁকে প্রতিটি পাঠ্যবস্তুর বিষয় ধ'রে পৃথক পৃথক পাঠনের উপকরণকে (Teaching aids) কাজে লাগাতে হবে।

প্রচুর উদাহরণ ও প্রয়োজনস্থলে নক্সা, চার্ট ইত্যাদির প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। মোট কথা শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার (Audisvisual aids) যথেষ্ট অবকাশ সৃষ্টি ক'রতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, যারা পিছিয়ে প'ড়েছে বিষয় অনুসারে তাদের শ্রেণী-বিভাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপশ্রেণীতে তাদের পাঠনের ব্যবস্থা করার সার্থকতা আছে। এই সব উপশ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হবে ও কিছু কিছু ভালো ছেলেও

থাকবে। তবে এই উপশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কাজের মধ্যে দিয়ে শিখবে। যে বিষয়ে দৈন্য সেখানে সে অন্য শিক্ষার্থীরও সহায়তা নিতে পারবে। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, শিক্ষকের অনুপ্রেরণা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় এনে দেবে। এই সব শ্রেণীতে পাঠনকাল যথেষ্ট হ'বার প্রয়োজন ও শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ হ'তে হবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মনে আত্ম-প্রত্যয় ও অনুরাগ জন্মিয়ে দেবার পর তাকে বাড়ীতে অনুশীলনের জন্যে নিয়মিত কাজ দিতে হবে ও তা নিয়ে আলোচনা ক'রতে হবে। তবে বাড়ীর কাজ খুব কমই দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল শিক্ষার্থি-মনে উৎসাহ ও অনুরাগ জাগানো। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা না হ'লে এ সমস্যার সমাধান হওয়া মুস্কিল।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় নির্দ্দেশের সমস্যা

ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য প'ড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে কিভাবে পরিমাপ করা যায়? অনেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের অখণ্ড সামগ্রিক রূপের প্রতিই আস্থাবান্, তাকে খণ্ডছিন্নভাবে উপাদানে বিশ্লেষণ করা তাঁদের মতে অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের দিক্-দর্শনের সার্থকতা আছে ব'লে স্বীকৃত হ'ল। নানা অভীক্ষার আযোজন দিকে দিকে শুরু হ'ল।

অভীক্ষা প্রণীত হ'ল বুদ্ধি, বিষয়ানুরাগ, বিষয়জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষার জন্যে।

বুদ্ধি-পরীক্ষাঃ

ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ্ বিনের (Alfred Benit) প্রচেষ্টায ১৯০৪ সালে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার প্রচেষ্টা হয়। তিনি বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্যে একটি অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন। এই অভীক্ষায় তিনি বিচারবুদ্ধি, যৌক্তিকতা, মনোনিবেশের ক্ষমতার সামগ্রিক পরিচয় পাবার প্রয়াসী।

প্রত্যেক বয়সের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের কাঠিন্য অনুযায়ী বিন্যাস করা হ'য়েছে এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক এক বছরের উপযোগী ছয়টি ক'রে প্রশ্ন দেওয়া

আছে। যখন কোন পরীক্ষার্থী কোন বয়সের উপযোগী সব প্রশ্নগুলিরই সমাধান ক'রতে পারবে, তখন সে তার পূর্ণ মূল্য পাবে ও তার মানসিক বয়স সেই অনুযায়ী হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, যদি কেউ ছ'বছর বয়সের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সব প্রশ্নগুলিরই সমাধান ক'রতে পারে, তবে তার মানসিক বয়সের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল ছয় বছরের ওপর। তারপর একে একে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান ক'রতে দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন বয়সের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সব প্রশ্নেরই সমাধান ক'রতে অক্ষম হয়। এইভাবে বুদ্ধি-পরীক্ষার দ্বারা মানসিক বয়স (Mental age) স্থির হয়।

শিক্ষায় নির্দ্দেশ ঃ

শিক্ষাই জীবন—জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সাথে নির্দ্দেশের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণরূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এই দিকেই শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি। একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন হয়ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন, শক্তি ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তাছাড়া নানা কারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'তে পারে। তাই শিক্ষায় নির্দ্দেশের একান্ত প্রয়োজন। জগতে যে প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হ'ল প্রধান লক্ষ্য।

নির্দ্দেশের অর্থ—শিক্ষায় নির্দ্দেশের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান-আহরণের পথে যে-কোন সহায়তাকেই নির্দ্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পেছিয়ে প'ড়ছে, শ্রেণী-পাঠন কে কেন অনুসরণ ক'রতে পারছে না এই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দ্দেশ বলা চলে। আর কোন শিক্ষার্থী কোন পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ ক'রলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে যাবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে—সেই বিষয়বস্তু বা শিক্ষাধারা নির্ব্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দ্দেশের সংকীর্ণ অর্থ।

নির্দ্দেশের প্রকার-ভেদ—নির্দ্দেশের বিভিন্ন প্রকার থাকলেও শিক্ষায় নির্দ্দেশ আজ শিক্ষাবিদ্‌দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। কিন্তু এই নির্দ্দেশের সাথে অন্য প্রকার নির্দ্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন—বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশ। ভাবীজীবনে যার যে বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দ্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দ্দেশের মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন। এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সব নির্দ্দেশের গুরুতে আছে শিক্ষায় নির্দ্দেশ।

শিক্ষায় নির্দ্দেশের লক্ষ্য—

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা।

(খ) পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চ'লতে সাহায্য করা।

(গ) নিজের রুচি, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা নির্ব্বাচন করা।

নির্দ্দেশের বিশেষ অর্থ—আজ আমাদেব দেশে বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীকে নির্দ্দেশ দেবার প্রশ্ন উঠেছে। তার রুচি, শক্তি ও পরিবেশ অনুযাযী নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় শিক্ষালাভ ক'রতে হবে। যদিও কযেকটি বিষযে সকলকেই জ্ঞানলাভ ক'রতে হবে। যে কযটি ধারার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে তাদের মধ্যে Science, Technical ও Humanities-এর কযেকটি কারণে এপর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন বেশী ক'বে সম্ভব হ'যেছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা; কারণ যদি সব শিক্ষার্থীই তার রুচি ও শক্তি অনুযাযী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্যারও উদ্ভব হ'যেছে। প্রথম সমস্যা হ'ল নির্দ্দিষ্ট ধারায নির্দ্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে।

(১) কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে? (২) কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে এই নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে? দুটি প্রশ্নই নির্দ্দেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কি কি গুণ বা বৃত্তি নির্দ্দেশক হবে ঃ

আজও অনেকের মনে ধারণা যে, বোধ হয় বুদ্ধিই (Intelligence) পরিচালনার পথে প্রধান নির্দ্দেশক। অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্ব্বাচনের সময়ে প্রধান নির্দ্দেশক ব'লে ধ'রে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল নির্ব্বাচন ও নির্দ্দেশ এক নয়। তাছাড়া যখনই নির্দ্দেশের কথা উঠে তখনই ভাবতে হবে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকলকেই কোন একটি ধারার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে হবে আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এবং পল্লীবাসী। তাই এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিযে এই নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয, অথচ নির্দ্দেশ সার্থক হ'য়ে ওঠে।

বুদ্ধিকে প্রধান নির্দ্দেশক ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্ত্তমান। বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে, এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে প'ড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যাবিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধিরই লোক বেশী। এখন বুদ্ধি পরিমাপের পব যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি অঙ্কের পার্থক্য দেখা যায, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দ্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে? তাহ'লেই দেখা যায়, কোন্ বুদ্ধি অঙ্ক কোন্ ধারার শিক্ষায় নির্দ্দেশের গবেষণা ছাডা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন।

অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দ্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে পারে, তা বিশ্লেষণ ক'বলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সাথে বিভিন্ন শাখায় সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিষয়ানুবাগ ও প্রবণতার সাথে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ানুরাগ (Interest) ও প্রবণতাকে (Aptitude) নির্দ্দেশের মাপকাঠি হিসেবে না নিলে বোধ হয় ভুল হবে।

বিষয়ানুরাগ ঃ

প্রবণতার সাথে অনুরাগকে এক ক'রে দেখলে ভুল হ'বে। কারণ প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পল্লীবাসী, তার যান্ত্রিক প্রবণতা (Technical Aptitude) শিল্পাঞ্চলের অবস্থাপন্ন মনের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সাথে এক হবে না। তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দ্দেশের মাপকাঠি ক'রলে দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্যে এমন কোন মূল উপাদানকে ভিত্তি ক'রতে হবে যা অধিক অবস্থানিরপেক্ষ। অর্থাৎ যার সঙ্গে দক্ষতা ও কাজেকাজেই দক্ষতা অর্জ্জনের সুযোগের বিশেষ সম্পর্ক নেই।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার সার্থকতা—জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা আত্ম-প্রত্যয়ের বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, যতই উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই শিক্ষার্থী কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে, যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয় শিখবার সুযোগ না পাবার জন্যে হয়ত বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে। ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা নির্দ্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ানুরাগের কথা মনে জাগে। তাই ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি—এ পর্য্যন্ত যত বিষয়ানুরাগের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে। কিন্তু এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরের মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান পাবার চেষ্টা করা হবে, তার উত্তর দিতে হ'লে শিশু-কিশোরগণের আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি গুণের অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার এই নূতন পদ্ধতি

উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোন একটি পদ্ধতিই নির্দ্দেশের পথে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হ'চ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হ'তে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

অভীক্ষা ১—এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের ওপর প্রণীত হ'য়েছে। যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে—এই হ'ল অনুমান। তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে আছে যার উত্তর ক'রতে হ'লেও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুরাগের প্রয়োজন।

অভীক্ষা ২—এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া আছে। সাধারণতঃ ছয় রকমের কাজ আছে। কোনটি রঙ্ দেওয়া, বা কিছু যোগ ক'রে কোন কিছু আঁকা, আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ানো অংশগুলি কোথায় কোন্‌টি লাগবে তা লিখে দেওয়া। মোট কথা অভীক্ষাটি কাগজে-কলমে নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে-কলমে যে-কোন প্রকার কাজ ক'রতে পারে।

অভীক্ষা ৩—এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুক্‌রো টুক্‌রো সংবাদ। যে যার রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ প'ড়ে বিস্তারিত বিবরণী প'ড়বে ও পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত ক'রবে। অবশ্য সংবাদগুলির কোনটি যন্ত্র, কোনটি কৃষি, কোনটি চারুকলা, কোনটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে। মোট কথা ছয় রকমের অনুরাগকে কেন্দ্র ক'রেই এই সংবাদগুলি রচিত হ'য়েছে ও যে যার বিষয়ানুরাগ অনুযায়ী প'ড়তে পারবে।

অভীক্ষা ৪—(ফ্লাসকার্ড)—এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিস আঁকা থাকবে। কার্ডটি মুহূর্ত্তের জন্যে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে, সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক কার্ডে অনেকগুলি ক'রে জিনিস থাকবে। যদি ৮খানি কার্ড দেখানোর শেষে দেখা যায় যে, একটি বিষয়ের জিনিসই অপেক্ষাকৃত বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী

শিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অনুরাগ ধরা হবে। এই হ'ল বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্যে উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা। তবে বিষয়ানুরাগ যাচাই ক'রতে হ'লে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া প্রয়োজন এবং যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল হয়, তার জন্যে উপদেশ নির্দ্দেশের প্রয়োজন।

নির্দ্দেশের পদ্ধতিঃ

নির্দ্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিবিধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এই তথ্য-সংগ্রহের জন্যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যেমন—

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ।

(খ) শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে পরে তা থেকে নির্দ্দেশের উপাদান সংগ্রহ করা।

(গ) অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া।

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ।

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ।

(চ) অভিভাবকদের মতামত-সংগ্রহ।

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি ক'রে নির্দ্দেশ দিতে হবে। কোন্ গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন্ ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে, তা-ও নির্দ্দেশকের জানা থাকা দরকার। যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দ্দেশ ত্রুটিপূর্ণ হ'তে পারে।

অনুমিত নির্দ্দেশের সমস্যা

বর্ত্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দ্দেশের পথ সমস্যা-সমাকীর্ণ। যে সব সমস্যা এই ক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে।

প্রথমতঃ, সুষ্ঠু নির্দ্দেশের জন্যে বিদ্যালয়ে নানা কার্য্যকরী অভীক্ষার আয়োজনের অভাব। এই আয়োজন সময়সাপেক্ষ, ফলে বিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দেশও বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক-নির্দ্দেশকের (Teacher Counsellor) নির্দ্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন। অনেক সময় অভিভাবক অবস্থাপন্ন হ'লে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হ'য়ে উঠবে। কারণ যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ ক'রবার প্রয়াস চ'লবে। ফলে যে বিজ্ঞান-শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান-শাখায় ভর্ত্তি করাবার একটি দুর্দ্দম প্রয়াস চ'লবে।

তৃতীয়তঃ, ভাবীজীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে অধিকাংশ অভিভাবকই বিজ্ঞান-শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্ত্তি ক'রতে চাইবেন। ফলে একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশপ্রার্থীর সংখ্যা তদনুপাতে কম হবে।

চতুর্থতঃ, যে যে বিভাগে বা শাখায় ভর্ত্তি হবে পরে সে শাখা তার ভালো না লাগলে বা সে যোগ্যতার পরিচয় না দিলে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই অল্প।

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেবে। কারণ কেউ যদি কৃষ্টিমূলক বিষয় নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ ক'রতে চায়, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে। তাছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে, সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়-বস্তুর বোঝা প্রায় সকলকেই টানতে হ'চ্ছে—শুধু পার্থক্য হ'ল তার নির্ব্বাচনী বিষয়ের (Elective Subjects) বেলায়। তবে কি সাধারণ পাঠ্য-বিষয়ের সাথে সাথে নির্ব্বাচনী বিষয় (Elective Subjects) সংযোজিত হ'লেই তা বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের উপাদান হ'য়ে উঠবে?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে, এই বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের ভাবীজীবনের সাথে সংহতির সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রবে তারা কর্ম্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ ক'রবার সুযোগ না পায়, তবে তাদের এই অর্জ্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না।

আলোচনা :

অনেকে নব-প্রবর্ত্তিত বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সঙ্কোচক ব'লে মনে করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত ক'রবার কোন ইঙ্গিতই নাই—বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য। তবে এই আয়োজনের যা-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্রমশঃ ধরা প'ড়বে, সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন করার প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা, যে সব বিদ্যালয় বর্ত্তমানে বিবিধার্থসাধক নয়, তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়, যতদূর শোচনীয় হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে ততদূর হবার কোন কারণ নেই। কোন অভিভাবকই তাঁর সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না; ফলে যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থসাধক না হ'লেও তাতে সাময়িক-ভাবে ভর্ত্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে এবং বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই। তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি সুগম হয়, তাহ'লেও এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা Humanities নেবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই বিজ্ঞান বা যান্ত্রিক শাখার যোগ্যতা নেই—ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর হ'লেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হ'তে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, তার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের কৃষ্টিমূলক শিক্ষার (Liberal Education) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের কৃষ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র ক'বে তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে এই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের বেকার সমস্যা যাই হোক, যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অগ্রসর শিক্ষার্থীদেরও বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা দিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহ'লে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু সান্ত্বনা মেলে।

তবে যখন আমাদের নির্দ্দেশ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্য্যকরী হ'য়ে উঠবে, তখন অভিভাবকদের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে ও সংশয়ের অবসান হবে। যতদিন আমাদের নির্দ্দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ না হ'চ্ছে, ততদিন পরীক্ষামূলকভাবেই এই দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। ততদিন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবনের ইতিহাস, পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তৎপরতা ও অন্যান্য পরিবেশে তার ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র ক'রে অভিভাবকের সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রে নির্দ্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে এবং কোন সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত ব'লে ধ'রে না নিয়ে কিছুদিনের জন্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষকের পর্য্যবেক্ষণাধীন রাখা বাঞ্ছনীয় হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[এক]

সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী

সার্থক শিক্ষণের জন্যে শিক্ষকের প্রস্তুতির প্রয়োজন। শিশুর মনকে মনে রেখে এই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র ক'রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে।

ডল্টন ল্যাবোরেটারী প্ল্যান ঃ—আমেরিকার ডল্টন শহরে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার জন্ম হ'য়েছিল। উদ্ভাবন করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মিস্ হেলেন পার্খাষ্ট (Miss Helen Parkhurst)। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে জ্ঞান সঞ্চয়ন ক'রবার প্রভূত অবকাশ ও সুযোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায় এই পরিকল্পনায়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এই শিক্ষা পরিকল্পনা। এখানে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর ওপর দায়িত্ব বেশী ন্যস্ত হ'য়েছে। শিক্ষক উপদেষ্টার আসন নিয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেন। এতে শ্রেণী-পাঠনার কোন ব্যবস্থা নেই—তাই এই পরিকল্পনা শ্রেণী-পাঠনের মৃত্যুঘণ্টা ব'লে বর্ণিত হ'য়েছে। অবশ্য শিক্ষার্থিগণকে বিষয়ের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এক এক শ্রেণী হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং কে কোন্ বিষয় কিভাবে শিখবে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অধীতব্য বা শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত ক'রতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ডল্টন-পদ্ধতির মুলনীতি

(ক) শিক্ষায় স্বাধীনতাই হ'ল এই পরিকল্পনার অন্যতম নীতি। আপন আগ্রহের তাগিদে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শিক্ষার্থী যে কাজ করে, তা স্বভাবতঃই শ্রেয়স্কর। শিক্ষায় স্বাধীনতার এই স্বীকৃতি এক যুগান্তর আনল, ফলে চপল শিশু-মনের বিস্তার ও বিকাশ সম্ভবপর হ'য়েছে।

(খ) সহযোগিতা এই পরিকল্পনার মূলমন্ত্র। দলবদ্ধভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা কাজ ক'রতে শেখে এই পরিকল্পনায়। একে একে দায়িত্ব পালন ক'রতে শেখে এই সব শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেওয়া নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন ক'রে। নির্দ্দিষ্ট কাজ সুরু করার আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :—

শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নির্দ্দেশকমাত্র—কারণ এখানে শ্রেণী-পাঠনের কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই বিদ্যালয়ে কোন সময়-তালিকাও (Time Table) থাকে না।

এক এক বিষয়-শিক্ষার জন্যে এক-একটি শ্রেণীকক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই শ্রেণীকক্ষেই বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার সরঞ্জাম থাকে। ফলে বিষয় অনুযায়ী পরিবেশ-রচনার প্রয়াস এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়-তালিকা না থাকায় শিক্ষার্থীরা এক শ্রেণীকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনমত চলাফেরা ক'রতে পারে। প্রত্যেকেই আপন আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ফলে একজনের সব বিষয়ে সমান অধিকার বা উন্নতি হ'তে না-ও পারে এবং তার জন্যে তার অগ্রগতিও ব্যাহত হবে না।

নির্দ্দিষ্ট কাজের সমাপ্তির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার উন্নতি। বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থিগণ যে সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করে, তা পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন বিষয়ে পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। এই পদ্ধতিতে অন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এই পদ্ধতির সুবিধা ঃ—

(ক) এই শিক্ষাবিধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে শিখতে পারে। ক্রমশঃ তারা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে, শিক্ষার প্রতি যত্নবান হয়।

(খ) নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার পথে পদক্ষেপ এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে সম্ভবপর।

(গ) শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্যে ব্যাহত হয় না।

(ঘ) শিক্ষার্থিগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয়, কারণ দায়িত্ব-জ্ঞান, অধ্যবসায়, আত্ম-প্রত্যয় প্রভৃতি গুণ স্বতঃস্ফূর্ত কাজের মধ্যে ক্রমশঃ উৎসারিত হ'তে থাকে।

(ঙ) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে এক-একটি পরিবেশ রচনা সম্ভবপর হয়। এক-একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী এক-একটি বিষয় শিখতে পারে।

(চ) প্রত্যেকে প্রত্যেকের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে আর তাতে সমগ্র বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধা :—

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থিগণের চেষ্টাকেই প্রাধান্য দেওয়ার ফলে অল্পবুদ্ধি বা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী নয়, কারণ শিক্ষকের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষালাভে অক্ষম।

(খ) এই পদ্ধতিতে সব বিষয়ের শিক্ষা সম্ভবপর নয়। কারণ যে-সব বিষয়ের শিক্ষাদানে শিক্ষককেই প্রধান অংশ নিতে হয, সেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহযোগিতা ছাড়া দুরূহ বিষয়-বস্তু আয়ত্ত ক'রতে পারে না।

(গ) অনেক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। বিষয়-বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, পাঠাগার বা বিষয়-কক্ষের স্বল্পতা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপরিণতির জন্যে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হ'তে পারে না।

(ঘ) কেবল পাঠ্য-পুস্তকই এই শিক্ষাবিধিতে জ্ঞান আহরণের উৎস হ'লে অনেক শিক্ষার্থীই অলসভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পায় ও ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'তে পারে।

(ঙ) এই শিক্ষাবিধিতে পাঠোন্নতি নির্দ্ধারণের নীতি ত্রুটিপূর্ণ।

আলোচনা ঃ

ডল্টন-পদ্ধতি বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, একথা সত্য। কারণ অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থাই অনুকূল নয়। তবে শ্রেণী-পাঠনের অনুপূরকভাবে

এই পদ্ধতির প্রয়োগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। বিশেষ ক'রে উর্দ্ধতন শ্রেণীতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থিগণকে স্বচেষ্টায় জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। যে-সব বিষয় শ্রেণী-পাঠনের মাধ্যমে আয়ত্ত হ'য়েছে সেগুলির অনুশীলন স্বচেষ্টায় সম্ভবপর। তাছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট বিষয়-শ্রেণী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজের বা উন্নতির হিসাব রাখবার জন্যে যে রেখাচিত্রের প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে, তা শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক। শিক্ষক এক দৃষ্টিতে সমগ্র শ্রেণীর লেখা-পড়ার উন্নতি লক্ষ্য ক'রতে পারেন এবং প্রয়োজনস্থলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাহায্য বা নির্দ্দেশ দিতে পারেন। মোট কথা, ডল্টন-পদ্ধতির সুসমঞ্জস আংশিক প্রয়োগ বর্ত্তমান অবস্থায় সার্থক।

কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method)

অধ্যাপক ডিউয়ির মতে, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত কর্ম্ম-প্রেরণা শিক্ষার পথকে সুগম ও প্রশস্ত করে। শিশুর মধ্যে যে সৃষ্টির তাগিদ লুকিয়ে আছে, তা কাজের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। তাই ডিউয়ি শিশুর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্যে 'কার্য্য-সমস্যা' পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ব'লে মনে করেন না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা হয় তাকে কেন্দ্র ক'রেই এই কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতি।

তাই শ্রেণী-পাঠনের পরিবর্ত্তে স্থান পেল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকলাপ। সমস্যাগুলি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধ'রে তাদের সমাধানের দিকে অনুপ্রেরণা দেওয়াই হ'ল এই পদ্ধতির মূল কথা।

নানা পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীই তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রে যে অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রবে, তাই হবে শিক্ষার্থীর পরম পাথেয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে শিক্ষককে নেপথ্যে থাকতে হয়। কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়-জ্ঞানও ক্রমশঃ অর্জ্জিত হয়।

কার্য্য-সমস্যার দুইটি প্রকার-ভেদ দেখা যায়। যেমন—(ক) বুদ্ধিমূলক ও (খ) কার্য্যমূলক।

(ক) বুদ্ধিমূলক সমস্যা :—

সব সময়ে প্রকৃত কাজটি না ক'রেও সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া যায়। সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ ক'রতে পারলেই শিক্ষার্থীকে সাফল্যের গৌরব দেওয়া হয়। কারণ এই কার্য্য-সমস্যার কল্পিত সমাধানই প্রয়োজনীয়। যেমন কোন শিক্ষার্থীকে যদি ক'লকাতা থেকে নালান্দা যাবার একটা কার্য্য-সমস্যা দেওয়া হয়, তবে সে নালন্দায় না গিয়েও এই সমস্যার সমাধান ক'রতে পারে। কখন, কি উপায়ে, কোন্ পথে, কত ব্যয়ে, কি কি জিনিস সঙ্গে নিয়ে তাকে যেতে হবে, তা বুদ্ধির সাহায্যে সে নিরূপণ ক'রতে পারে। টাইম টেবিল, মানচিত্র ও অন্যান্য পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে সে যদি এই যাত্রার কল্পিত বিবরণী সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে, তবেই কার্য্য-সমস্যাটির সমাধান হ'য়েছে ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়।

অনুরূপ নানা কাজের মাধ্যমে এই কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির অনুশীলন ঘট্‌তে পারে। যেমন নানা নাগরিক কর্ত্তব্য, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদিকে ঘিরে কার্য্য-সমস্যা তুলে ধরা চলে।

(খ) কার্য্যমূলক সমস্যা :—

শিক্ষার্থী বাস্তব কাজের মাধ্যমেই যাতে অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রতে পারে ও শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়, সেজন্যে নানা কার্য্যমূলক সমস্যা-সমাধানের জন্যে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। বিষয়-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলিকে নির্ব্বাচন করা হয়। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় কাজগুলি সম্পাদন ক'রবার প্রয়াসী হয় ও উপায় উদ্ভাবন ক'রতে থাকে। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সৃষ্টির আনন্দ পায় ও সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রতে পারে।

এই কার্য্য-সমস্যা নানা রকমের হয়। যেমন কোন কিছু তৈরী করা—বাগান করা। সহজ থেকে কঠিনের দিকে ক্রমশঃ যাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশে থেকেও নানা কার্য্য-সমস্যার আয়োজন করা যায়, কিন্তু ক্রমশঃ ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে বৃহত্তর পরিবেশে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে।

কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) কাজের ইউনিট্ ঠিক করা।

(খ) পরিকল্পনা করা।

(গ) কার্য্য সম্পাদন করা।

(ঘ) বিচার-বিশ্লেষণ করা।

(ক) শিশুরাই কাজটিকে নানা পর্য্যায়ে ও ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে চেষ্টা ক'রবে। এই গোড়ার কাজ স্থির ক'রতে হ'লেও ছোট ছেলেদের শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন। তাই শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়ে শিক্ষার্থীদের ইউনিট্ স্থির ক'রতে সহায়তা ক'রবেন।

(খ) ইউনিট্ স্থির হ'য়ে যাবার পর শিশুরা কাজের পরিকল্পনা ক'রবে। কোন্ দল কাজের কোন্ ইউনিট্ ভাগ ক'রে নেবে ও কিভাবে তা নির্ব্বাহ ক'রবে, তা নিয়ে পরিকল্পনা ক'রবে। এটি কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ।

(গ) কাজটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর একটি দল এক-একটি কাজের ভার নেবে ও কাজ সমাধা ক'রবার চেষ্টা ক'রবে। প্রত্যেকটি দলের মধ্যে কাজটিকে আবার ভাগ ক'রে নিতে হবে যাতে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হয়।

(ঘ) কাজটির শেষে বিচার-বিশ্লেষণের স্তর। সকলে কাজটিকে বিচার ক'রে নিজের নিজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা ক'রবে।

প্রোজেক্ট্ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

(ক) বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সহায়তা করা হয় এই কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির কল্যাণে। বিভিন্ন বিষয়কে একই সূত্রে গ্রথিত ক'রে ছাত্রের অর্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের সুযোগ ক'রে দেয় এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি।

(খ) বাস্তব জীবন ও শিক্ষার মাঝে ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে ও শিক্ষা বৈচিত্র্যময় হয়। কারণ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। ফলে শ্রেণী-পাঠনের গতানুগতিকতা থেকে শিক্ষার্থীর মন নিষ্কৃতি পায়।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচিত হয় ও বিষয়-বস্তুর প্রয়োগ জ্ঞানের সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়।

(ঘ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জাগে। তাদের প্রাণশক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হওয়ার ফলে শিক্ষায় আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রবল হয়।

(ঙ) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান সুগম হয়। শিশুর কৌতূহলী মন বিশ্লেষণের সুযোগ পায়।

(চ) এই পদ্ধতিতে দলবদ্ধ ক্রিয়া-কলাপের অবকাশ থাকায় সামাজিক চেতনার উন্মেষ হয়। তাই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মন্তব্য সার্থক। কারণ তাঁর মতে "Project is a whole-hearted purposeful activity in a social environment."

(ছ) সমস্যা সৃষ্টির ফলে শিক্ষায় প্রেরণা সঞ্চার হয় এবং শিক্ষার্থি-মন সজীব ও সতেজ থাকে।

কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির অসুবিধা :—

(ক) এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হ'ল এই যে, যারা স্বল্পবুদ্ধি ও অলসপ্রকৃতির তাদের পক্ষে কার্য্য-সমস্যার সমাধান সহজ নয়। তাছাড় কাজের ইউনিটগুলি বুদ্ধি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একইরূপ সম্ভাবনাযুক্ত নয়, ফলে প্রত্যেক দলের বুদ্ধি-প্রয়োগের অবসর ও অবকাশ সমান হয় না। তাছাড়া অনেক সময় বুদ্ধির উন্মেষের চেয়ে হাতের কাজেই দক্ষতা বেশী জন্মায়। কারণ এমন অনেক কাজই বারবার শিক্ষার্থীর সামনে এসে পড়ে, যাদের মধ্যে মিল আছে। ফলে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-প্রয়োগের অবকাশ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে।

(খ) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ধরা পড়ে না। ফলে অনেকেই শিক্ষকের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে পারে।

আলোচনা ঃ

কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক দিকে যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আমাদের বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন। শ্রেণী-পাঠনকে একেবারে উঠিয়ে দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত বাঞ্ছনীয় নয়, তবে শ্রেণী-পাঠন ও বিদ্যালয়-জীবন বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হ'লে কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতির প্রাচুর্য্য থাকবার দরকার।

কয়েকটি বিষয়-পাঠনে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে। বর্ত্তমানে সমাজ-তত্ত্ব (social studies) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয়। কিন্তু এই বিষয়টি এতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় যে, এর শিক্ষা-পদ্ধতি শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। তাই এখানে নানা প্রোজেক্টের সার্থকতা।

এই পদ্ধতিকে কার্য্যকরী ক'রতে হ'লে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার যথেষ্ট পরিমার্জ্জনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি যতদিন গতানুগতিক থাকবে, ততদিন এই সব পদ্ধতির বহুল প্রচলন ও প্রয়োগ ব্যাহত হবে।

একটি প্রোজেক্টের নমুনা

নালন্দা-ভ্রমণের পরিকল্পনা :—

ক'লকাতার কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে কাজটিকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে পারে।

একদল—যাওয়ার জন্যে সব রকম আয়োজনের ভার নিল—কি কি সঙ্গে নিতে হবে, কোন্ পথে যাওয়া হবে ও কোথায় থাকা হবে ইত্যাদি।

আর একদল—রেলওয়ে কন্‌সেশনের জন্যে দরখাস্ত করা, হোটেলে বা অন্য কোন পরিচিত স্থানে চিঠি দেওয়া, রেলে সিট্ রিজার্ভেসনের জন্যে আবেদন করা ইত্যাদি।

তৃতীয় দল—চাঁদা তোলা, খরচের হিসাব-পত্র রাখা ইত্যাদি।

চতুর্থ দল—নালন্দার যাত্রার বিবরণী তৈরী করা ও নালন্দা পৌঁছানো না পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা।

পঞ্চম দল—নালন্দা সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, কোন নক্সা বা ছবি এঁকে নেওয়া, কোন স্মৃতি সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ দল—ফিরে এসে নালন্দার প্রবন্ধ রচনা করা বা কবিতা লেখা।

সপ্তম দল—নালন্দার নক্সা দেখে মডেল তৈরী করা।

নমুনাটির মধ্যে দেখা যায় যে, নানারূপ সৃজনমূলক কাজের অবকাশ আছে। গণিত, হিসাব-নিকাশ, প্রবন্ধ রচনা, ইংরাজী চিঠিপত্র লেখা, আঁকা, মডেল

তৈরী করা, ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ, ভৌগোলিক জ্ঞান, সবরকম বিষয়কে একই সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভবপর হ'তে পারে এইরূপ এক-একটি কার্য্য-সমস্যা নির্ব্বাচন ক'রলে।

উইনেট্‌কা পদ্ধতি

এই শিক্ষা-পদ্ধতিটির প্রবর্ত্তন আমেরিকার উইনেট্‌কা নামক স্থানে সম্ভবপর হয়।

ডল্টন-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষার যে ব্যবস্থা হ'য়েছে, তার সঙ্গে দলগত কাজের সমন্বয়-সাধনের এই প্রয়াস। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে দুটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হ'য়েছে—শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ও দলগত কাজকে ভিত্তি ক'রে। প্রথম শ্রেণীর কাজ হ'ল কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত ব্যক্তিগত কাজ। মূল প্রয়োজনীয় বিষয়কে নিয়েই এই কাজ প্রত্যেকেই ইউনিট্‌ অনুযায়ী ক'রে যায় ও কাজের শেষে শিক্ষকের কাজ থেকে প্রাপ্ত সমাধানের সঙ্গে তার উত্তর মিলিয়ে দেখে। শিক্ষকের দেওয়া সমাধানগুলি একটি কাগজে লিপিবদ্ধ নির্দ্দেশকের কাজ করে। কাজের ইউনিট্‌গুলি সহজ থেকে কঠিন হ'তে থাকে ও একের পরে একটির নির্ভুল সমাধান শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেয়। একটি ইউনিটের কাজ শেষ হ'লে তাকে কেন্দ্র ক'রে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

পরীক্ষায় অসাফল্য ঘট্‌লে পরীক্ষার্থীকে আবার পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রতি ইউনিটের পূর্ণ সমাধান হ'লেই পরীক্ষায় সাফল্য ঘোষণা করা হয়। এই গেল প্রথম শ্রেণীর কাজ।

দলগত কাজ নিয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ। প্রতিদিন ক্রিয়াকেন্দ্রিক অথচ দলগত কাজের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতার উন্মেষ ঘটে ও সৃজনাত্মক বুদ্ধির বিকাশ হয়। এই সমস্ত কাজের জন্যে গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির কোন ব্যবস্থা নাই।

সকল শিশুর শিক্ষায় অগ্রগতি এক নয়। তাই এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুর ব্যক্তিগত পার্থক্য ও নিজ নিজ গতির হার সম্পর্কে সচেতন।

শ্রেণীগত শিক্ষার ফলে সকলের বিষয়-জ্ঞান একরূপ হয় না—তাই উইনেট্‌কা পদ্ধতি শিক্ষার ব্যক্তিগত সমস্যাকে মর্য্যাদা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বচেষ্টায় বিষয় আয়ত্ত ক'রতে পারে, সে সম্পর্কে শিক্ষার সূত্র ও নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে। কোন একটি বিষয়ের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে, কারণ সময়পত্রের ধরা-বাঁধা কোন নির্দ্দেশ নেই। যে যার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে।

আলোচনা ঃ

একদিকে ডল্টন ও অন্যদিকে কার্য্য-সমস্যা পদ্ধতি এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের প্রচেষ্টা উইনেট্‌কা পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য ও সহযোগিতা দুইএরই মূল্য স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে এই পরিকল্পনায়। তাই বর্ত্তমান বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না।

আলোচনামূলক পদ্ধতি (Workshop Method)

এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন সাম্প্রতিক। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি এই পদ্ধতির মূলে আছে। প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রতি মর্য্যাদা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে।

তাই শিক্ষণ আজ শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে নানা সমস্যা তুলে ধরা হয়, কখনও তারাই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়। নানা Group-এ বিভক্ত হ'য়ে এক-একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় ও পরে পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয় ও শ্রেণী কর্ম্মমুখর হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে ও সহযোগিতার মাধ্যমে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সক্রিয় ও সজাগ হ'য়ে ওঠে।

এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা সভা ও গোষ্ঠীগত আলোচনা দুই-ই ঠাঁই পেয়েছে। ফলে পারস্পরিক চিন্তাধারার বৈচিত্র্যে সকলেই সমৃদ্ধ হয়।

সুবিধা: অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার প্রকাশে যে-কোন বিষয়-বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে ধন্য হয় এবং অন্যের মতামত সম্পর্কে সহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। ফলে একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে।

অসুবিধা: এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে শিক্ষকের নৈপুণ্যের প্রয়োজন। শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে অনেক সময় আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ হয়।

শিক্ষণের জন্যে উপকরণ

শিক্ষার মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। তা ক'রতে হ'লে শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ-আয়োজনের কার্পণ্য থাকলে চ'লবে না।

পাঠ অনুযায়ী উপকরণের ব্যবস্থা না ক'রলে কেবল ভাষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহ জাগানো সহজ নয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠায়। কেবল তাই নয় পাঠকে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে চাই সৃজনাত্মক ক্রিয়ার অবকাশ —যাতে শিক্ষার্থী নিজে হাতে-কলমে কিছু শিখবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে পাঠন-ব্যবস্থা তা সব সময়েই অধিক ফলপ্রসূ হয়। তাই পাঠের মধ্যে শিক্ষার্থিগণকে সক্রিয় রাখবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

সার্থক পাঠনের জন্যে শিক্ষককে যেমন পরিশ্রমী হ'তে হবে, তেমনি তাঁর মৌলিকতা থাকবার প্রয়োজন। কি ভাবে কোন্ বিষয়কে বেশী উপভোগ্য ক'রে তোলা যায়, তা শিক্ষককেই উদ্ভাবন ক'রতে হবে।

তবে কয়েকটি উপকরণ প্রায় প্রত্যেক পাঠেই অপরিহার্য্য। যেমন—ব্ল্যাক-বোর্ড, তালিকা ইত্যাদি। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়-বস্তু-পাঠনে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণের সার্থকতা অনেক বেশী।

সাধারণতঃ যে যে উপকরণকে সহজে প্রয়োগ করা যায়, তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল :—

ব্ল্যাকবোর্ড, তালিকা, নক্সা, ছবি বা মডেল, সময়-তালিকা, কোন প্রাচীন নিদর্শন, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, প্রতিকৃতি, ম্যাপ, গ্লোব ও অন্যান্য উপকরণ।

ব্ল্যাকবোর্ড :

শিক্ষকের পাঠকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হ'লে চাই উদাহরণের বৈচিত্র্য। আর উদাহরণগুলিকে সজীব ক'রে তুলতে হ'লে বোর্ডের ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন।

বিষয়-বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধ'রতে হ'লে কেবল ভাষণের দ্বারাই তা সম্ভবপর হয় না। যাতে শিক্ষার্থী দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও শিখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এজন্যে বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। সাহিত্যের পাঠে কঠিন শব্দের অর্থ, সার-সংক্ষেপ, বা অন্য কোন বিষয়-বস্তুকে সকলের দৃষ্টিপথে আনতে হ'লে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সার্থক। বোর্ডের ওপর প্রয়োজনমত নক্সা আঁকতে পারলে পাঠ আরও সজীব হ'য়ে ওঠে।

তালিকা ও নক্সা :

বিষয়-বস্তুকে সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে তালিকা ও নক্সার প্রয়োজন খুবই বেশী। তালিকার সাহায্যে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি ফলপ্রসূ। ফলে শিক্ষার্থীর মন সহজে পাঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষক পাঠকে তালিকা ও নক্সার সাহায্যে সহজে পরিস্ফুট ক'রতে পারেন। এছাড়া ফ্লাসকার্ড (Flash-card) ও নানারূপ তালিকার উপযোগিতাও আছে।

ছবি ও মডেল :

কি সাহিত্য, কি ইতিহাস-ভূগোল, প্রত্যেক বিষয়-বস্তুকে সার্থকভাবে উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে ছবি ও মডেলের বিশেষ উপযোগিতা আছে। পাঠকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে এ দুইটি উপকরণকে বাদ দেওয়া চলে না।

ভাবনা ও ধারণাকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে (concrete) প্রতীকের মূল্য দিতেই হবে। অবশ্য এজন্যে শিক্ষককে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রতে হবে। নিজে

ছবি আঁকতে না পারলে অন্যের সাহায্য নিয়ে তৈরী মডেল বা ছবি পাঠের সময় দেখানো যায়।

সময়-তালিকা, প্রাচীন নিদর্শন (মুদ্রা, শিলালিপি, পুঁথিপত্র ইত্যাদি) :

ইতিহাস-পাঠনে সময়-তালিকা বা প্রাচীন নিদর্শনের যথেষ্ট মূল্য আছে। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হ'লে সময়-তালিকার বিশেষ প্রয়োজন। সেইরূপ যদি কোন প্রাচীন কাহিনী পড়াতে পড়াতে সেই সময়ের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি বা বিদ্যার্থীর পুঁথিপত্র সামনে তুলে ধরা হয়, তবে বিষয়-বস্তু অনেক বেশী উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে।

ম্যাপ, গ্লোব, স্লাইড :

ইতিহাস-পাঠনের মত ভুগোল-পাঠনে যে সব উপকরণের বিশেষ উপযোগিতা আছে তার মধ্যে চার্ট, ম্যাপ ও গ্লোবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে যে-কোন বিষয়ের পাঠনে আলোক-চিত্রের প্রচলন সুরু হয়েছে। স্লাইড, এপিডায়াস্কোপ ও নানারকম আলোক-চিত্রের ব্যবহার ব্যয়সাধ্য হ'লেও তার উপযোগিতা সম্পর্কে আজ কোন সন্দেহ নেই।

আদর্শ পাঠ ঃ—

পাঠকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে যেমন উপকরণের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির। তাই আদর্শ পাঠ সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষককে সচেতন হ'তে হবে। প্রত্যেক পাঠের জন্যে একটি ক'রে পরিলেখ প্রস্তুত ক'রবার প্রয়োজন যাতে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় পাঠ এগুতে পারে। প্রত্যেক জিনিসকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে তার পেছনে চাই একটি ক'রে পরিকল্পনা। তাই আদর্শ পাঠ দিতে হ'লে এই পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক আদর্শ পাঠের কয়েকটি স্তর আছে ; যথা—আয়োজন, উপস্থাপন ও অভিযোজন। আয়োজন বা প্রস্তুতির স্তরে শিক্ষার্থীদের মনকে পাঠের অভিমুখী ক'রে তুলতে হবে। এজন্যে এই স্তরে শিশুর পূর্ব্বজ্ঞানের পরীক্ষা ক'রে নূতন পাঠ্য বিষয়-বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই হবে এই স্তরের কাজ।

এই স্তরের কাজ শেষ হ'লে নূতন বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনের প্রয়াসী হ'তে হবে। কি ক'রে নূতন বিষয়ের সাথে নানাভাবে শিক্ষার্থীর নিবিড় পরিচয়

করিয়ে দেওয়া যায়, তাই হবে চেষ্টা। এই স্তরে বিষয়ের আবৃত্তি, কঠিন অংশের পরিস্ফুটন, প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শ্রেণীর বোধ-পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষয়কে পরিস্ফুট ক'রে তুলবার জন্যে প্রশ্নোত্তর বিশেষ সহায়ক। কেবল তাই নয়, প্রশ্নোত্তরের শেষে বিষয়-বস্তুটির উপর সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতি সচেতন হ'তে হবে।

শেষে অভিযোজনের স্তর। এই স্তরে শিক্ষককে খুব সন্তর্পণে এগুতে হবে। কারণ এই স্তরে কেবল শিক্ষার্থীর বোধ পরীক্ষাই হবে না—তার যুক্তি, বিচার-বুদ্ধি, অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টিরও পরীক্ষা হবে। এজন্যে এই স্তরে শিক্ষকের প্রশ্ন হবে খুব চিন্তামূলক।

আদর্শ পাঠের জন্যে পাঠ-পরিলেখের (Lesson Plan) প্রয়োজন। পরিশিষ্টের অংশে দুই-একটি পরিলেখের নমুনা দ্রষ্টব্য।

[দুই]

শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা

শিশুর জীবনে অনুভূতির মূল্য ও প্রভাব খুব বেশী। তাই তার শিক্ষা-পদ্ধতিতেও থাকবে অনুরূপ আয়োজন। স্বাধীনভাবে যাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে শিক্ষালাভ ক'রতে পারে, সেজন্যে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। শিশু যখন জীবন সুরু করে, তখন নানাভাবে তার সংগ্রাম সুরু হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হ'ল আত্ম-প্রকাশের জন্যে সংগ্রাম। চঞ্চল তাদের মন, আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর। তাই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুরু ক'রতে হবে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা।

সেজন্যে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনা ক'রতে হ'লে তাকে করতে হবে ক্রিয়া-কেন্দ্রিক। খেলাধুলা, নানারূপ সৃষ্টির কাজ, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে। এখানে হাতের কাজ

হবে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম, আনন্দই হবে প্রধান উপকরণ। কাজ ও খেলা এ দু'টি হবে পরস্পরের সম্পূরক। একটির সাহায্যে অপরটি সার্থক হবে।

শিশু যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, মায়ের কোল-ছাড়া হ'য়ে সে এই প্রথম বাইরের জগতে পদার্পণ ক'রল। তাই যাতে শিশুর মন থেকে অপরিচয়ের শঙ্কা তাড়াতাড়ি দূরে যায়, সেই চেষ্টা ক'রতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর শক্তি অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের সব রকম সুযোগ দেওয়া। তাই তদনুযায়ী পাঠক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা ক'রতে গেলে শিশু-মনের সাথে পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে—শিশু হ'ল কর্ম্মপ্রবণ ও সৃষ্টিধর্ম্মী। তাই বিদ্যালয়-পরিবেশকে শিশুর এই প্রয়োজন মেটাবার অনুকূল ক'রে তুলতে হবে এবং যাতে ছেলেবেলা থেকে শিশু স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর অভ্যাস গঠন ক'রতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতাই হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গণতন্ত্রের আদর্শ।

পাঠ্য-বিষয় :

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলা ;

(২) সৃজনাত্মক কার্য্য ও কারুশিল্প ;

(৩) ভাষা ও সাহিত্য ;

(৪) পরিবেশ-পরিচিতি এবং

(৫) শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হবে বাঞ্ছনীয়। কারণ, শিশু শ্রোতা হ'তেই চায় না—হ'তে চায় কর্ম্মী। তাই শিশুর সহজ প্রবৃত্তি ও আগ্রহ জানাই হ'চ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের প্রধান কাজ। কাজ ক'রে হাতে-কলমে শেখাই হবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। তাই শিক্ষককে থাকতে হবে নেপথ্যে—শিশুরাই সব-কিছু হাতে-কলমে শিখবে, ভাঙবে, গড়বে। কেবল কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে শিক্ষক এসে বন্ধু হিসেবে সাহায্য ক'রবেন।

তাই তাঁকে হ'তে হবে ধৈর্য্যশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও দরদী। কখনও দরদী বন্ধুর আসন নিয়ে, আবার কখনও বা স্নেহশীলা মায়ের বাৎসল্য নিয়ে শিশুর মন বুঝে তাঁকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে। তাই বিষয়-বস্তুর চেয়ে শিশুকে জানবার প্রয়োজন তাঁর বেশী।

শিক্ষা-প্রণালী :

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কোন বই-এর প্রয়োজন নেই। কেবল তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয়। আত্ম-প্রকাশের পথে শিশুকে নানাভাবে সুযোগ দিতে হবে। যাতে ক'রে তার কল্পনা ও আত্ম-প্রত্যয় ক্রমশঃ পরিণতি লাভ ক'রতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষককে ধৈর্য্যসহকারে শিক্ষা দিতে হয়। কারণ, শিশুর কাছে কর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই।

তাই নানা সৃজনাত্মক কাজ তাদের কাছে ভালো লাগে। ছবি আঁকা ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তারা মনের ভাবাবেগকে ভাষা দেয়। শিক্ষক তাদের কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবেন। মোট কথা, শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে চাই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, আর দরদী মন।

একদিকে যেমন শিক্ষাকে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি তার পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীকে খাপ খাওয়ানোর পথেও সহায়তা ক'রতে হবে।

এজন্যে চাই তার শিক্ষা। পরিবেশ ব'লতে বুঝায় বিদ্যালয়-পরিবেশ, গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ। এই পরিবেশের মাঝেই লুকিয়ে আছে তার শিক্ষার উপাদান। কোথাও প্রকৃতি রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও বা মানুষের স্পর্শ। তাই শৈশবে সে প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই সব কিছু শিখবে। আর শিক্ষকের কাজ হবে দুইএর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা।

ভাষা-শিক্ষা :

ভাষা-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তাই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের প্রয়োজন কম নয়।

এই পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই প্রথমেই শিশুদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাক্য সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়ে দিতে হবে। বাক্য থেকে ক্রমশঃ শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়াই নাকি আধুনিক রীতি-সম্মত। বাক্যগুলি এমনভাবে একে একে শিশুর সামনে তুলে ধ'রতে হবে, যাতে বাক্যেব মধ্যে থেকে সে একটা অর্থ খুঁজে পায়। তাব কাছে যা অর্থহীন, যা তার অভিজ্ঞতার বাইরে—তা শেখা তার পক্ষে সহজ নয়। ক্রমশঃ পরিচিত শব্দের মধ্যে দুই-একটি ক'রে নতুন শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে জানা থেকে অজানার দিকে শিশুর যাত্রা সুরু ক'রতে হবে। আদর্শ পাঠ দিয়ে পাঠে শিশুর উৎসাহ জাগাতে হবে। এর জন্যে শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে গোড়া থেকে নজর দিয়ে তাদের কথার জড়তা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। প্রথমে শিশুরা স্বভাবতঃ বানান ক'রে পড়ে—পরে অভ্যাস-গঠনের পর তারা একসাথে সমস্ত শব্দটিই প'ড়তে পারে। একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে শিশুর দেরী হয়, সেজন্যে শিক্ষককে ধৈর্য্যহীন হ'লে চ'লবে না।

প্রথমে পরিচিত শব্দ-সমষ্টিকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষা সুরু হবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম-লেখা কার্ড থেকে নাম প'ড়তে শিখবে। কোন শিশুর যদি এই অবস্থাতে আগ্রহ না মেটে, তবে তাকে আরও প'ড়তে দিতে হবে।

পড়ানোর কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। যে ভাবে যে শিশু আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রবে, সেইভাবে তার পড়া সুরু করা উচিত। তবে শিশুর আগ্রহ সাধারণতঃ বাক্যের দিকে খণ্ড খণ্ড পদের দিকে। তাই বোধ হয় বাক্যকেন্দ্রিক-পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। পরিচিত সহজবোধ্য শব্দ দিয়েই নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিক্ষা সুরু হবে :

(১) বাক্য দিয়ে পড়া সুরু ক'রতে হবে ;

(২) শব্দগুলির সাথে শিশুর পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় ;

(৩) পাঠে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকবে না ;

(৪) পুনরাবৃত্তির জন্যে শব্দগুলির পুনরুল্লেখ থাকবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, বর্ণমালা না শিখে কি ভাবে শিশু প্রথমেই বাক্য শিখবে। কিন্তু শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অনুসারে শিক্ষা দিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলির সাথে তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিচয় ঘটে। বাক্য ও বর্ণ নিয়ে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। উদ্দেশ্য হবে বাক্য ও শব্দ পরিচয়।

ভাষা-শিক্ষার পথে গল্প ও ছড়ার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে ছেলেদের ভাষা-শিক্ষার আগ্রহ জাগবে।

শিশুরা যখন প্রথম স্বাধীনভাবে পড়তে পারে, সেই সময় তাদের হাতে উপযুক্ত বই তুলে দিতে হবে। বইগুলির ভাষা সহজ ও সরস হওয়া উচিত। বইগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকার প্রয়োজন, যাতে তা শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক হয়।

দর্শনেন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে শিশু আহরণ ক'রবে জ্ঞানের পাথেয়। তাই এই সময় মৌখিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়।

এই স্তরে শিক্ষার মোটামুটি লক্ষ্য হবে :

(১) আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া ;

(২) সৃজনী-শক্তির বিকাশ ;

(৩) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ;

(৪) আত্মনির্ভর জাগানো ;

(৫) সমাজ-চেতনার উন্মেষ ;

(৬) ব্যক্তিগত সদভ্যাস গঠন (যেমন—বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্বজ্ঞান, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি)।

তবেই সম্ভব হবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ,—তবেই হবে যোগ্য নাগরিকের জন্ম।

পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি

পড়াশুনা করাবার আগে শিশুর মনকে শিক্ষা-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করা চাই। অনেকের ধারণা, লেখার আগে পড়া শেখানো উচিত। কিন্তু মণ্টেসরি

প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিশুকে আগে লেখা শেখানো উচিত। শিশু স্বভাবতঃই কাজ চায়। তাই লিখতেও সে ভালবাসে।

শিশুকে লিখতে শেখাবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন :

(১) লেখা শেখাবার আগে শিশুদের হাত ও আঙ্গুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি তাদের আয়ত্তে আসা চাই, যাতে তাবা রেখার মাধ্যমে সহজে কোন পরিচিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে।

(২) যে শব্দ শিশুরা শিখবে, তার রূপের সাথে তাদের নিবিড পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। লেখার কাজকে সুগম ক'রতে হ'লে বহু অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই অনেক সময় বালির ওপর কাঠ দিয়ে আঁচড় কাটতে দেওয়া বা শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে হিজিবিজি কাটা তার লিখবার পূর্ব্ব-প্রস্তুতির কাজ করে।

প্রথমে হিজিবিজি কাটতে কাটতে যখন অক্ষরের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে, তখন তাকে অক্ষবে পরিণত করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে।

প্রথম প্রথম অক্ষরগুলি শিশুর কাছে এক-একটি ছবি ব'লে মনে হয। কিন্তু পরে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার চোখে পডবে। এই সময় বালির কাগজ দিয়ে তৈরী অক্ষর শিশুকে দিয়ে তার ওপর হাত বুলাতে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলির নামও শিশু উচ্চারণ ক'রবে। ফলে অক্ষরগুলির স্মৃতি শিশুমনে নানারূপে জেগে থাকবে। তাছাড়া, নানা রঙে অক্ষরগুলো কার্ডবোর্ডেব ওপব লিখে শিশুর সামনে একে একে সাজিয়ে তাদেব সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে শিশু তা আনন্দের সঙ্গেই শেখে। ফলে, লেখা ও পড়া শেখা একসাথে চ'লতে থাকবে। আবার শিশুকে কোন্ কোন্ অক্ষরগুলিব মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। যথা—ব, র, ক, ধ, ঝ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে একটি আকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায।

শিশুদের পড়াশেখাব কাজে এই লিপির সাথে পরিচয় বিশেষ সাহায্য ক'রবে। যুক্তাক্ষরগুলির সাথে পরিচয প্রথমে না করানোই ভাল।

পাঠকে উপভোগ্য ক'বে তুলতে হ'লে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, তার আঙ্গিককেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলার প্রয়োজন। বইএর ছাপা থেকে সুরু

ক'রে মলাট পর্য্যন্ত সব-কিছু শোভনীয় হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে শিশুদের জন্যে যে বই তার পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন ছবি থাকবে—আর ছাপার অক্ষরগুলিও বেশ বড় বড় ও সুন্দর হবে।

লেখা ও পড়া দুটি বিষয়েই সাহায্য হয়, যদি শ্রেণীতে শ্রুতিলিপি দেওয়া যায়। শ্রুতিলিপি শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় ও মাংসপেশীর মধ্যে যে শুধু সংহতি স্থাপন করে, তা নয়—পড়তেও সহায়তা করে। নিজের লেখা দেখে ও পড়ে সে নিজেই আনন্দ পায়, ভাবে কি ক'রে শব্দকে সে রেখায় রূপ দিল। তবে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতদিন না শিশুরা তা অনায়াসে পারে, ততদিন যেন প্রথমে বেশ কয়েকটি কথা একমনে শুনে তার পরে লিখতে চেষ্টা করে। লেখার সৌষ্ঠবের দিকেও নজর রাখতে হবে। একে একে সে আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে। যে-সব গল্প ও রূপকথা সে শুনবে, সেগুলি তার মনে কল্পনার রঙ লাগাবে ও পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে। ক্রমশঃ সে নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রবে।

শিশু যখন আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে, তখন তার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কখনও রূপকথার গল্প, কখনও পৌরাণিক আখ্যান, কখনও ছড়া, কখনও কবিতা, কখনও বা ছোটখাট নাটকের অংশ প্রস্তুতীকরণ হিসাবেই উপস্থাপিত করা যায়। এতে শিশুর কল্পনার প্রসার হয়, আত্ম-প্রকাশের জন্যে প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ক্রমশঃ তার দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করা ও তাকে আরও বাস্তবের উপযোগী ক'রে তোলবার প্রয়োজন।

গণিত-শিক্ষা ঃ

গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। কিন্তু এই দুটি শক্তির বিকাশের ওপর নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যৎ। বাস্তব জীবনে হিসেবনিকেশের প্রয়োজন আছে। গণিত-অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শিশুর কার্য্য-কারণবোধ জন্মায়, আত্ম-বিশ্লেষণের দিকেও শিক্ষার্থী সজাগ হ'য়ে ওঠে। প্রাত্যহিক জীবনে গণিতের প্রয়োজন অস্বীকার ক'রবে কে? কারণ, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কাজে হিসেবনিকেশের মূল্য কম নয়।

গণিত শেখানোর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মনে আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ক'রে দিতে হবে ; মুদ্রা-পরিচয়, রৈখিক পরিমাপ, সংখ্যা-গণনা প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহ ও সুযোগ দিতে হবে।

ছড়া ও খেলার সাহায্যে গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী।

একে একে শিশুকে দিন-পঞ্জীর সাথে পরিচিত করিয়ে দিলে সে সংখ্যাগুলি আনন্দের সাথে ব'লবে। মোট কথা, সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশুকে যেমন বুঝতে হবে, তেমনি তার দলগত অর্থও তাকে বুঝতে হবে।

এজন্যে নানা রকমের সংখ্যা-চিহ্নিত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে। তেঁতুলবিচি, কড়ি বা কুঁচ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার অর্থ যেমন শিশুমনে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া যায়, তেমনি পুঁতির মালা নিয়ে সংখ্যার দলগত অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ক্রমশঃ যোগ, বিয়োগ ও সমান চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার প্রথম সোপান নির্ম্মিত হবে।

দোকান দোকান খেলা ও খেলার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষা অগ্রসর হবে।

সংখ্যা-গণনা, যোগ-বিয়োগ শিক্ষা-সম্পর্কে Abacus-এর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এইজন্যে পুঁতির মালা ও অনুরূপ কোন জিনিসের ব্যবহার করা যেতে পারে।

চৌকো আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে দশটি তার লাগানো থাকে এবং প্রত্যেকটি তারে দশটি ক'রে ছিদ্রযুক্ত বিভিন্ন রঙ-করা বল লাগানো থাকে—সেগুলি নাডাচাড়া ক'রে শিশুরা অঙ্ক শিখতে পারে। হাতের কাজ ও অঙ্ক-শিক্ষা এবং বিশেষ ক'রে গণনা একসঙ্গে চ'লতে পারে।

যখন সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে, তখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্ধভাবে তাদের যোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়া অনুসরণ ক'রতে না ব'লে, শিশুকে লিখিত কার্ডের সাহায্য নিতে ব'লতে হবে, আর এই কার্ডগুলি শিক্ষককে তৈরী ক'রে দিতে হবে।

যোগ-বিয়োগের সঙ্গে গুণ-ভাগের সম্পর্কটিও শিশুমনে প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই স্তরে শিক্ষকের ধৈর্য্য হারালে চ'লবে না—কারণ সমস্ত গণিত-শিক্ষার ভিত্তি এই যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা

প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তারই মাঝে লুকিয়ে আছে শিক্ষার সামগ্রী। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা-কিছু লুকিয়ে আছে, তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কাজ।

একে একে শিশুর দৃষ্টি ফিরবে পরিবেশের দিকে, মানুষের সৃষ্টির দিকে, সমাজের দিকে। ক্রমশঃ সে বুঝতে শিখবে যে, অতীত থেকেই বর্ত্তমানের জন্ম। ফেলে-আসা দিনের কথা জানতে শিশু কৌতূহলী হবে। অতীতের কাহিনী, দেশ-বিদেশের কথা, পুরাতন দিনে মানুষের জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার জানবার আগ্রহ কার না জাগে?

গ্রামের ভাঙ্গা মন্দির, প্রাচীন দেবালয়কে কেন্দ্র ক'রে সুরু হবে শিশুর ইতিহাস-শিক্ষা। কালের অমোঘ প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তা শিশুমনকে কল্পনালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

ইতিহাস-শিক্ষার গতানুগতিক পুরাতন পদ্ধতি আর যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

তাই শিশুর অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে ভিত্তি ক'রে গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন কাহিনী, সেকালের কথা পরিবেশন ক'রলে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ হয়।

ইতিহাস-পাঠনকে কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়:—

(ক) জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে,

(খ) নির্দ্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে এবং

(গ) কাজের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের কাহিনী শিশুমনে রেখাপাত করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অসংলগ্ন কাহিনীর পরিবেশন বিশেষ সার্থক হ'য়ে ওঠে না। তাই যখন কোন কাহিনী পরিবেশন

করা হবে তখন পরিবেশকের প্রধান লক্ষ্য হবে, ঘটনার ক্রম-বিকাশের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা।

নির্দ্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস শেখাতে গেলে দুই ভাবে তা সম্ভবপর হ'তে পারে :—

সমাজের ঘটনাক্রম অনুসারে বিষয় নির্বাচন করা ছাড়াও প্রসঙ্গ নির্বাচন ক'রেও তা সম্ভব হ'তে পারে। অবশ্য প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় শিক্ষককে সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হবে।

ইতিহাস শেখানোর নতুন পদ্ধতি হ'ল—ক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। কাজের ভেতর থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে, তাই হবে ইতিহাস শেখার মূল উপাদান।

পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর দৃষ্টি হবে প্রসারিত, ফলে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ক'রবার পথ হ'বে প্রশস্ত। কখনও পল্লী বা নগরের পরিক্রমাকে কেন্দ্র ক'রে মানচিত্র-রচনা—কখনও বা নানারূপ তথ্যমূলক ছবি ও লিপি সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষা সার্থক হ'যে ওঠে।

আর শিক্ষকের কাজ হবে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করা।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রথম শৈশবে গতানুগতিক ইতিহাস শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় না। তথ্যের চাপে তাদের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

তাই দেশ-বিদেশের আবিষ্কার বা ভ্রমণ-কাহিনী শিশুদের কাছে পরিবেশন ক'রতে হবে। নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ ও সরস হ'য়ে ওঠে। নয় বছর পর্য্যন্ত ইতিহাস-শেখা এইভাবে চ'লবে। তারপর নানা উপায়ে ইতিহাস-শেখা আরম্ভ হ'তে পারে। পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে স্থানীয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলি দেখে ও তাকে বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস-শেখা শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই সুগম হয়।

কোন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ক'রেও ইতিহাস-শেখানো সাধারণতঃ সার্থক হ'য়ে ওঠে। ইংরাজীতে একে বলা হয় Project Method ; অভিনয় ও বিভিন্ন

ক্রিয়ার মাধ্যমে তাই একে 'কার্য্যসমস্যা পদ্ধতি' বলা যায়। এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

মোট কথা, আজ ইতিহাসকেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হ'চ্ছে। তাই ইতিহাস কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণীই নয়, তার মধ্যে থাকা উচিত সাধারণ মানুষের কান্না-হাসির কাহিনী, সমাজ-সংসারের চিত্র। মানুষের পদক্ষেপকেই অবলম্বন ক'রে ইতিহাস গড়ে ওঠে। তাই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস শেখানো বাঞ্ছনীয়।

ভূগোল-শেখানোর পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ হবে। কারণ কেবল জলস্থলের বিবরণই ভূগোল নয়, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কি ভাবে মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে, কি ভাবে মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে অনুকূল ক'রে তুলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল শেখাতে হবে।

ভূগোল-শিক্ষা আজ মানব-কেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে ভূগোল-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিজের বাসস্থান, পল্লীকে ঘিরে সুরু হবে ভূগোল-শিক্ষা। আর ঋতু, আবহাওয়া, সূর্য্যের উদয়াস্ত—এসব দিকে একে একে শিশুর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গ্রামের কাছাকাছি নদী, হ্রদ, পাহাড় ও জঙ্গল থাকলে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে শিশুর দৃষ্টি হবে সজাগ। রাতের তারা-ভরা আকাশের দিকে, বেলাশেষের আলো-ছায়ার দিকে, ঋতুর বিবর্ত্তনের দিকে একে একে শিশুকে সপ্রতিভ ক'রে তুলতে হবে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টি হবে প্রসারিত পল্লী থেকে নগরীর দিকে, প্রান্তর থেকে মরুর দিকে, দীঘি থেকে হ্রদের দিকে, স্তূপ থেকে পাহাড়ের দিকে।

সাধারণ-বিজ্ঞান-পাঠন :

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান-পাঠের উদ্দেশ্য হবে—(ক) শিশুর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিকাশে সাহায্য করা, (খ) ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা ও (গ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলা।

প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা আছে। কারণ, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানকে ঘিরেই সুরু হবে তার বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা। বিজ্ঞান-পাঠনের দুটি পদ্ধতি আছে :—

(ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে এবং

(খ) বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে :

হাতে-কলমে সব-কিছু পরীক্ষার দ্বারা প্রকৃতিরাজ্যে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, তা হ'ল তার বিজ্ঞান-শিক্ষার পরম পাথেয়। ক্রমশঃ জীব ও জড় জগতের দিকে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে প'ড়বে।

বিশেষ পদ্ধতি :

শ্রেণীতে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে অনেক সময় তা অধিক ফলপ্রসূ হয়। ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে শিশুরা শিক্ষায় আনন্দই পাবে। অবশ্য শিক্ষার্থীকে নানা উপকরণ তৈরী ক'রতে উৎসাহিত করতে হবে—যেমন জলঘড়ি, বায়ুর গতিপথের নির্দ্দেশক ছোটখাট যন্ত্র ইত্যাদি। মোট কথা শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান-বিষয়ে অনুরাগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

স্থানীয় নমুনা-সংগ্রহ থেকে সুরু ক'রে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত তৈরী করবার নানা নমুনা সংগ্রহ ক'রবার জন্যে তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি

ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি

ভূমিকা :

মানুষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হ'ল ভাষা মনের ভাব প্রকাশের জন্যে। যুগে যুগে এগিয়ে চ'লল মানুষের প্রকাশ-সাধনা। গ'ড়ে উঠল সাহিত্য, ছন্দ, অলঙ্কার। যা-কিছু সুন্দর তাকে স্থায়ী রূপ দিতে চাইল মানুষের মন অক্ষরের অক্ষয় মাধ্যমে। সাহিত্য-শিল্পের তাজমহল কালের কটাক্ষকে কটাক্ষ হানল।

ভাষা ভাবের বাহকমাত্র—সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার সার্থক রূপায়ণ। তাই কেবল ভাষা-শেখানোর পদ্ধতির চেয়ে সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি আরও দুরূহ।

কোন মনীষী ব'লেছেন—রচনাভঙ্গীর মাধ্যমেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। তাই সাহিত্য-পাঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে লেখকের অনুভূতিকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা। আর এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'লে শিক্ষণের বৈচিত্র্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

আর ভাষা-শিক্ষা হ'ল মূলতঃ অভ্যাসমূলক। তবে প্রত্যেক ভাষা-শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। কেবল প্রকাশের শুদ্ধিই সব নয়, প্রকাশের ঋদ্ধি ও সৌন্দর্য্যকেও সামনে রাখতে হবে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া উচিত এবং কোন শিক্ষা-পদ্ধতিকেই ধরাবাঁধা ছাঁচে ফেললে ভুল করা হবে।

ভাষা-শিক্ষার মূল কথা হ'ল, চিন্তাকে বাণীমূর্ত্তি দেওয়া আর শব্দকে ভাব ও ভাবনায় উত্তীর্ণ করা।

ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য তাই আজ প্রসারিত হ'য়েছে—সে কেবল শব্দ ও বাক্য-বিন্যাসেই আবদ্ধ নয়। ভাষা সে ভাবরাজ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার প্রধান বাহন। তাই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা না রেখে প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

প্রথম প্রশ্ন হ'ল মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? কারণ এই প্রশ্নের মীমাংসা না হ'লে তার পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা সার্থক হবে না।

মাতৃভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য :

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ হয়। মাতৃভাষাকে তাই শিক্ষার প্রধান সহায়ক ব'লে ভাবতে হবে।

ভাব ও ভাবনা, কল্পনা ও চিন্তা মাতৃভাষাকে আশ্রয় ক'রেই পরিপুষ্ট হয়। তাই মাতৃভাষা-শিক্ষার কয়েকটি লক্ষ্য লিপিবদ্ধ হ'ল :—

(ক) শিক্ষার্থিজীবনের বিকাশ ;

(খ) ভাবের উন্মেষ-সাধন ;

(গ) প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি, জাতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ;

(ঘ) আত্ম-প্রকাশে সহায়তা করা ;

(ঙ) মার্জ্জিত রুচি, সাহিত্য-প্রীতি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির উন্মেষ।

ভাষা-শিক্ষার ভিন্ন স্তর :

বিশ্বের সাথে নিত্যনূতন পরিচয়ে তিলে তিলে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হ'তে থাকে। আর সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে ভাষার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাকে শুধু কোন মতে বর্ণনা করাই নয়, তার শুদ্ধ ও সংহত প্রকাশ ভাষা-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আসে। আর শিক্ষা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার পথে সহায়তা করে।

ভাষায় রূপায়ণের আগেই অভিজ্ঞতার ক্রম-বিন্যাসের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ ও সেই সম্বন্ধকে অন্য নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার শক্তি প্রকাশের পেছনে থাকা চাই। তারপর এল প্রকাশের কথা—কি প্রকাশ ক'রব ও কি ভাবে প্রকাশ ক'রব?

কি প্রকাশ ক'রব—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে ব'লতে হয় যে যাকে প্রকাশ ক'রতে চাই তা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আবার অনেক সময় অনুভূতি-জাত। কিন্তু যাই প্রকাশ ক'রতে চাই না কেন—বক্তব্যকে স্পষ্ট ভাবে না জানলে প্রকাশের দৈন্য এসে যায়। তাই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান ও

বোধের স্পষ্টতা ভাষা-শিক্ষার পথে বিশেষ উপাদান। তার পরের প্রশ্ন হ'ল প্রকাশভঙ্গীকে কেন্দ্র ক'রে।

ভাষা-শিক্ষায় মূলতঃ শব্দ-সম্পদ ও তার অর্থবোধ, শব্দের যোজনা, বাক্য-বিন্যাস ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ, রসবোধ, কল্পনা, প্রতীকতার প্রয়োজন হয়।

ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার পদ্ধতি বড়ই জটিল। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এর পদ্ধতিও তাই বিভিন্ন। আর এই পদ্ধতি নির্ভর করে লক্ষ্যের উপর। তাই আগে মনে মনে উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে। যদি প্রকাশের শুদ্ধিই ভাষা-শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয় সে এক কথা, আর যদি ব্যঞ্জনা, কল্পনা, মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় সে স্বতন্ত্র কথা।

আগেই ব'লেছি স্থানকালপাত্রভেদে পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আনতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও চিত্তবৃত্তিকে ভুলে গিয়ে শিক্ষা দিলে তা কোনদিনই কার্য্যকরী হয় না।

তাই শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ধারা নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় :—

(১) শ্রেণী, বয়স, চিত্তবৃত্তির কথা ভেবে শব্দ-সম্পদের সাথে পরিচয় করানো ;

(২) শব্দের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের শক্তি জন্মানো ;

(৩) শব্দ ও শব্দ-চিত্রের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রচনা করা ;

(৪) শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাক্য-বিন্যাসের দিকে সজাগ করা ;

(৫) বিষয়-বস্তুর সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে দেওয়া ;

(৬) ভাব-বিন্যাস ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ;

(৭) রসবোধ, কল্পনাকে প্রকাশের মাধ্যমে রূপ দিতে সহায়তা করা।

সংক্ষেপে ব'লতে গেলে ব'লতে হয় যে, ভাষা ও সাহিত্য শিখবার পথে যে-সব স্তর অতিক্রম ক'রতে হয় সেগুলির সাথে পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন। প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রস্তুতি করিয়ে দিতে হবে।

প্রথমেই ভাষাতত্ত্বের কথা আসে। প্রকাশের শুদ্ধি ও সংহতি এর মূল লক্ষ্য।

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাথে পরিচিতি—বানান, অর্থবোধ সব-কিছুরই সার্থকতা আছে। তারপর শব্দ প্রয়োগ ও প্রকাশের কথা। তাই ব্যাকরণ পড়ানোর

সার্থকতা। যখন প্রকাশের শুদ্ধি এল তখন প্রকাশকে সহজ ও সুষ্ঠু করার জন্যে বাক্য-সম্প্রসারণ ও ছোট ছোট রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাখ্যা, সংক্ষিপ্তকরণ, ভাব-সম্প্রসারণ, প্রবন্ধ-রচনা একে একে ভাষা-শিক্ষণের সহায়ক হ'য়ে ওঠে।

ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য ও বিভিন্ন স্তর নির্দ্ধারিত হবার পরে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

ভাষা-শিক্ষার ক্রম

বলা-পড়া-লেখা :

পড়া-লেখার আগেই কথা বলা সুরু হয়। তাই মাতৃভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হয়। শুদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে শিশু ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর হয়।

তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কথোপকথনের মূল্য সবচেয়ে বেশী। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এর উপযোগিতা যথেষ্ট।

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ দু'রকমের পড়া প্রচলিত আছে—একটি বিস্তারিত, আর একটি ব্যাপক। শ্রেণী পাঠনায় বিস্তারিত পাঠের সার্থকতা থাকবেই। তবে ব্যাপক পাঠেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। যাতে সাহিত্যে ও ভাষায় অনুরাগ জন্মায়, যাতে পাঠ্যসূচীর বাইরেও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্পৃহা বাড়তে থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি দেবাব অবকাশ আছে। জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণের অভ্যাসের প্রয়োজন। এজন্যে নানা উপায়ে পাঠে অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়ে দিতে হবে। নানা বিষয়ের বই প'ড়তে প'ডতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়ে যাবে এবং পরোক্ষভাবেও তার মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প'ড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে বলবার ও লিখবার অবকাশ সৃষ্টি ক'রতে হবে। তবেই আত্ম-প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি আসবে। ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর শব্দ-পরিচিতি হবে কথা, লেখা ও পড়ার মাধ্যমে। কিন্তু পড়ার মাধ্যমে যে শব্দ-পরিচিতি হবে তার সক্রিয় প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। তাই অনেক সময়ে শব্দের সাথে পরিচয় হ'লেও সেগুলি সক্রিয় শব্দ-সম্পদে

(Active vocabulary) পরিণত হয় না। শব্দ-ধ্বনি ও বস্তুর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই শব্দের প্রয়োগ ক'রলে তবেই শব্দ-সম্পদ প্রকৃত সম্পদ্ ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে।

ভাষা যে চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একথা আজ মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন। তাই চিন্তাকে ব্যক্ত ভাষা থেকে ভিন্ন বলা যায়। অনেক সময় চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ব্যবধান খুবই সঙ্কীর্ণ হয়। চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে শব্দের পৃথক সত্তা সেখানে স্বীকৃত নয়। প্রকাশের পথে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। যাদের অভিজ্ঞতা অল্প তাদের কাছে কেবল শব্দ-পরিচিতির মূল্য বেশী নয়।

একদিকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অপরদিকে প্রকাশর জন্যে শব্দ-সম্পদ এই দুইএর সংহতি না হ'লে ভাষার ওপর আয়ত্তি সহজে আনা কঠিন। আবার ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু বিন্যাস ও সংহতি আসে। প্রকাশ ক'রতে হবে ব'লেই অনেক সময় অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ক'রবার প্রয়োজন হয়।

শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তাই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। যাতে চিন্তা ও বস্তুর মাঝে যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হ'ল, অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রকাশ ক'রতে বা বুঝতে সহায়তা করা। শব্দ-সম্পদ কেবল সেই প্রকাশের পথে সহায়তা ক'রবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল কি ক'রে স্বাধীন প্রকাশকে ও সুষ্ঠুবোধ উপলব্ধিকে পরিপুষ্ট করা যায়। প্রকাশের মাধ্যম একটি নয়। ভাষণে শুদ্ধ উচ্চারণের একান্ত প্রয়োজন। তাই গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি কথাকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ ক'রতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য ক'রতে হবে।

মানুষের মন খণ্ডছিন্নকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না। একটি সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে ধারণা জন্মালে তার পর খণ্ডছিন্ন অংশগুলির সার্থকতা ঘটে ও পারস্পরিক সম্পর্ক বোধ সহজ হ'য়ে আসে। এজন্যে পৃথকভাবে শব্দের সাথে পরিচিত না করিয়ে বাক্যের মাধ্যমে শব্দ-পরিচিতির দিকে আজ লক্ষ্য প'ড়েছে। আর

শিক্ষাদান সুরু করা উচিত কথন স্তর থেকেই। কথন ও কাজ এই দুইএর মধ্যে সংহতি সাধন তাই শিক্ষায় একান্ত বাঞ্ছনীয়। মোট কথা, শিক্ষার্থীর জন্যে এমন পরিবেশ রচিত হবে যা তাকে অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপক সৃষ্টি ক'রতে সাহায্য ক'রবে। এইভাবে শিশুমন পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। কথা বলা, কাজ ও খেলার স্তর থেকে ক্রমশঃ তার মন উন্নীত হবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে। তার উদ্দেশ্যাত্মক আচরণই তাই শিক্ষকের লক্ষ্য হবে। মোট কথা বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ ও বর্ণ-পরিচয়, কথন, পঠন ও লিখন এই ত্রিধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিযান হবে অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক। শব্দ-পরিচিতির সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ জড়িত। আর শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগের সঙ্গে উচ্চারণ ও বানানের প্রশ্ন জড়িত।

বলা-লেখা-পড়া এই তিনটিরই প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রতীকের সঙ্গে পরিচিতি। আর বানানের কাজ হ'ল প্রতীককে ঠিকমতো ব্যবহার করা। ঠিকমতো বানান শেখার পথে শুদ্ধ উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়, স্মৃতি আর হাতের স্নায়ুশক্তির ওপর বানান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, লেখা চাই, শোনা চাই।

বানান ভুলের দ্বিতীয় কারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসতর্কতা। তাই যখনই সে কোন কিছু প'ড়বে বা দেখবে তখনই সে তা ভালো ক'রে দেখবে। লেখবার সময়েও তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন।

পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় যে, আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের চোখ পংক্তির ওপর সচ্ছন্দ গতিতে চলে না। অনেক সময় পরিচিত শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা পড়ি না, শব্দের সামগ্রিক রূপই আমাদের মনে শব্দবোধ আনে। ফলে বানান ভুলের অবকাশ ঘটে। অনেক সময় আমাদের চোখ শব্দের কোন একটি বিশেষ অংশে নিবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক অক্ষর অগোচরে র'য়ে যায়। অনেক সময় চোখের চলাচলে ব্যাঘাত ঘ'টলেও বানান ভুলের অবকাশ ঘটে। আবার অনেকে হরফের প্রকৃত উচ্চারণ ক'রতে অক্ষম হয়।

তাই যাতে শৈশব থেকে প্রত্যেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ ক'রতে পারে, যাতে অক্ষরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থী পড়া অভ্যাস করে ও সতর্ক-দৃষ্টি দেয়,

সেজন্যে তাদের উৎসাহিত ক'রতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি প'ড়তে গিয়েও অনেক সময় অক্ষর বাদ প'ড়ে যায়। তাই কোন্ কোন্ শিক্ষার্থী কিভাবে পড়ার অভ্যাস করে, তাদের দৃষ্টি বানানের দিকে সজাগ কিনা, সেদিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও শিক্ষককে বানান ভুলের নানা প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে।

এর জন্যে নানা তালিকা ও শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার সুযোগ নিতে হবে। তাই বানানকে যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে নানা উপায় স্থির করার প্রয়োজন। এইজন্যে শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা ক'রে নির্দ্দিষ্ট শব্দ-ভাণ্ডারকে একে একে সামনে তুলে ধ'রতে হবে। বয়স অনুপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা স্থির ক'রে নিয়ে কাজে এগোনো দরকার। ক্রমশঃ যতই এই শব্দ-পরিচিতি ব্যাপক হবে ততই তার অনুশীলনের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষার্থী কি কি শিখবে?

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ ;

(খ) কাব্য ও সাহিত্য ;

(গ) ছন্দ ও অলঙ্কার।

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ

ভাষাতত্ত্ব শব্দোচ্চারণের ও ভাষার রূপতত্ত্বের জ্ঞানে অনেক সাহায্য হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন্ স্তরে এই জ্ঞান পরিবেশন করা উচিত এটি চিন্তনীয়। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সাধিত ও বহু-প্রচলিত শব্দের অর্থবোধকে পরিস্ফুট ক'রতে হ'লে ভাষাতত্ত্ব-শেখার সার্থকতা আছে। ভাষাতত্ত্বের কল্যাণে ভাষার বিবর্ত্তন ও মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাস জানা সহজ হয়। তাছাড়া শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা অনেক সময় সাহিত্যরসবোধকে স্পষ্ট ও ঘনীভূত করে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাষার বৈচিত্র্য, ছন্দ ও ইতিহাসের কথা বয়স ও মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে জানাতে হবে। তবে বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্ভবপর নয়। নানা ভাবে রচনায় ও অনুশীলনে এই শিক্ষার ভূমিকা তৈরী ক'রতে হবে।

ব্যাকরণ

বাংলা ব্যাকরণ-শিক্ষার উদ্দেশ্য :—

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—"ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলে উত্তম আর্থিকতাও হয় না, সুতরাং সাহিত্য শাস্ত্রের সম্যক্ অর্থগ্রহ হইতে পারে না।"

ব্যাকরণ পড়ানোর দুটি উদ্দেশ্য—একটি নিকট ও অন্যটি বৃহত্তর। নিকট উদ্দেশ্য হ'ল বাক্যেব গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে উপলব্ধি। বৃহত্তর লক্ষ্য হ'ল ভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগ বৃদ্ধি। তাছাড়া অন্যান্য ভাষা-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় এই ব্যাকরণের কল্যাণে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—"কোন্ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা যায়?" কেউ কেউ বলেন—বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখানোর সার্থকতা নেই। কারণ ভাষা শুনেই বাক্য গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন বর্ণের সম্যক্ উচ্চারণের জন্যে উচ্চারণ-স্থান শেখার কোন প্রয়োজনই নেই। শিক্ষকের উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ হ'লে তা শুনেই শিক্ষার্থী শিখতে পারে।

বিশেষতঃ শিশুদের কোমল মুখে নিয়মময় অস্থিসার-সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকরণ নিক্ষেপ করাকে অযৌক্তিক ব'লে অনেকেই মনে করেন।

শিশুমনস্তত্ত্বের সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মতে ব্যাকরণ-শিক্ষার কয়েকটি স্তর-ভাগ ক'রে নিয়ে ব্যাকরণ শেখানোর পদ্ধতি নিরূপণ ক'রতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী ও বয়স অনুযায়ী ব্যাকরণের বিষয়-বস্তুকে ভাগ ক'রে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্যাকরণের এই স্তর-বিভাগ একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী হবে ও সহজ থেকে কঠিনের দিকে, সমগ্র থেকে অংশের দিকে যাবে। বাক্য থেকে সুরু হ'য়ে শব্দ, পদ ও বর্ণের দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আগে বাক্য ও তার বিশ্লেষণ, পরে বিভিন্ন পদের মধ্যে সম্পর্ক-নির্ণয় ও এমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য লক্ষ্য ক'রে সূত্রের দিকে শিক্ষার্থী অগ্রসর হবে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়াই মনস্তত্ত্ব-সম্মত। একেই বলে অবরোহ পদ্ধতি। ব্যাকরণ নিয়মের রাজ্য, তাই নীরস নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে শিক্ষার্থিমন সহজে আকৃষ্ট হ'তে চায় না। তাই উদাহরণের বৈচিত্র্য, শিক্ষার্থীদের অধীত

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বহুল দৃষ্টান্ত, ছবি ও তালিকা ব্যাকরণ-পাঠকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে।

তাই ব্যাকরণ-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া।

উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত থেকে নিয়ম প্রণয়ন ক'রতে দিলে তাদের ব্যাকরণে অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। ব্যাকরণকে কেন্দ্র ক'রে নানা অনুশীলনী ও খেলার প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে। শ্রেণীকে ভিন্ন দলে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন ক'রলে শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই শিখতে পারে।
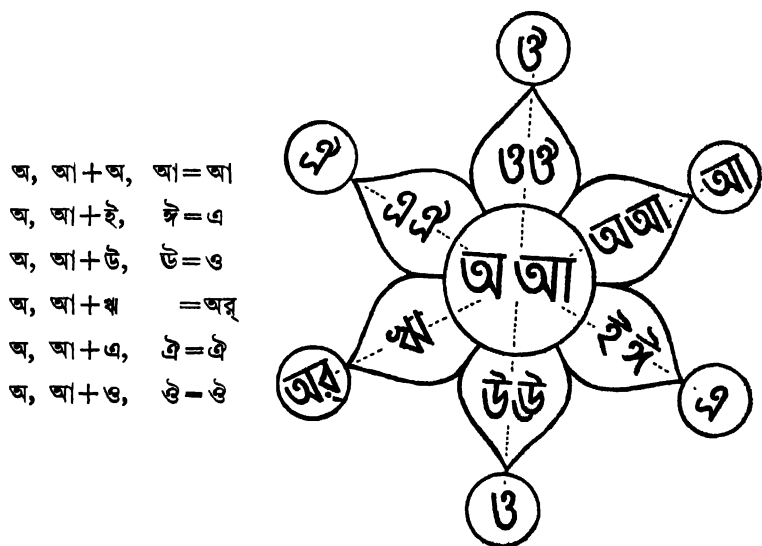
ব্যাকরণ-শিক্ষাতে ছড়া-ছবি ও নক্সার স্থান আছে। ব্যাকরণের জটিল বিষয়কে কোন ছড়া, তালিকা বা ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে তা সহজ ও সরস হ'য়ে ওঠে। যেমন সন্ধি শেখানোর সময় যখন স্বর-সন্ধিকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার জন্যে নানা উদাহরণ দেওয়া হ'ল ও তাদের সূত্রগুলি নির্দ্ধারণ ক'রতে বলা হ'ল। তখন স্বর-সন্ধিকে ঘিরে অনেকগুলি সূত্রই পাওয়া যাবে।

পরে সূত্রগুলিকে এক সাথে দেখাবার জন্যে বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে ফুল এঁকে বিষয়-বস্তুকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। যেমন—

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় ফুলটির মধ্যে অ আ-কে ঘিরে যত রকম স্বর-সন্ধি হ'তে পারে সবই দেওয়া আছে।

এতগুলি সন্ধি একটি ফুলের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এরূপ এক-একটি বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে আরও ফুল তৈরী করা যায়। তাই ছাত্রদের প্রথমে এলোমেলোভাবে অনেক উদাহরণ দিয়ে দেবার পর তাদের তা থেকে সূত্র আবিষ্কার ক'রতে ব'লতে পারা যায ও অনেকগুলি সূত্র যখন তারা একে একে আবিষ্কার করে, তখন তা দিয়ে এমন আরও ফুল তারা আঁকতে পারে।

মোট কথা, আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিকেই ব্যাকরণ শেখানোর কাজে অবজ্ঞা করা যায় না। শিশুকে শেখানোর বেলায় দুটি পদ্ধতিরই প্রয়োগ ক'রলে শিক্ষা সহজ হয়। কারণ শিশুর মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, তখন অবরোহ পদ্ধতি অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রতে পারে। তাই অনেক সময় এই দুটি পদ্ধতির সমন্বয় সার্থক।

ব্যাকরণ শেখানোকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন—

(ক) ঠিক কোন্ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা উচিত?

(খ) সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের কোন স্থান আছে কি না?

(গ) ব্যাকরণকে কি কি স্তরে ভাগ ক'রে শেখানো সহজ?

(ক) ঠিক কোন্ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা উচিত?

ব্যাকরণ পড়ানোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি বাক্য-গঠন সম্পর্কে ধারণা জন্মে দেওয়া হয়, তবে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলির মধ্যে সম্পর্ক-নির্ণয় ও বাক্য-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। তাই শিক্ষার্থীদের বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি-উন্মেষ না হ'লে প্রকৃত ব্যাকরণ শেখানোর কাজ আরম্ভ করা সমীচীন ব'লে মনে হয় না। একথা স্বীকার ক'রলে চতুর্থ শ্রেণীর নীচে ব্যাকরণ পড়ানোর অবকাশ কম। তবে শিশুমনের প্রস্তুতি এই স্তর থেকেই বাঞ্ছনীয়।

(খ) সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের স্থান কতখানি এ নিয়ে মতভেদ আছে স্বীকার ক'রতেই হবে। কারও মতে সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের আলোচনা

না করাই ভাল। তেমনি ব্যাকরণ পড়াতে সাহিত্যের কোন অংশ ব্যবহার করা চলবে না—এই হ'ল তাঁদের মত। অন্য মতবাদ হ'ল যে সাহিত্যরস উপলব্ধির পথে ব্যাকরণ অন্তরায় না হ'য়ে সহায়তাই করে।

ব্যাকরণের কল্যাণে শব্দের ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কোন শব্দের ব্যাকরণগত ও ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিলে বাক্যের স্বাদনা আরও সার্থক হ'য়ে ওঠে।

কাব্য-পাঠনেও ছন্দ ও ধ্বনির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাক্য-রচনা

চারিদিকে আমরা যা দেখি, সেগুলি আমাদের মনে কিছু দাগ ফেলে যায়। এর সম্বন্ধে অল্প চিন্তা ক'রলেই সেই সম্বন্ধে আমাদের মনে ভাবের উদয় হয়। আবার এমন অনেক বিষয়, বস্তু বা প্রাণী আছে যাদের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নেই, কিন্তু ধারণা আছে। এই ভাব ও ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত ক'রতে চেষ্টা করি। এইরূপ **ভাবকে ভাষায় যথাযথ প্রকাশ** করার নামই **বাক্য-রচনা**। একটি নির্দ্দিষ্ট রীতি বা নিয়ম অনুসারে বাক্য রচনা ক'রতে হয়, তা না হ'লে প্রকাশ সুন্দর ও শুদ্ধ হয় না।

একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হবে। কতকগুলি ইট, কাঠ, লৌহ সংগ্রহ ক'রলেই যেমন বাড়ী তৈরী করা যায় না, সেইরূপ কতকগুলি ভাব ও শব্দের যোজনা ক'রলেই বাক্য রচনা হয় না। দেখা যায় যে, বাক্য-রচনার মূল কথা—কি ক'রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত ক'রে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করা যায়।

> আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি করি আরাধনা,
> একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কহে মোরে—"পূরিবে প্রার্থনা
> যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধর দুটি পায়,
> তাঁরে পিতা বলি' মেন, তাঁরি হাতে আছে যেন ধনের উপায়।"

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হ'ন—"কি আছে আমার ?
যাহা ছিল সে সকলি, ফেলিয়া এসেছি চলি, ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি টুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে—"ঠিক্, বটে ঠিক্।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশ মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে পুতেছি বালুতে।
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক দূর, ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হ'য়ে উঠে ফুটি ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে কহে কত কি যে।
নদীপারে রক্ত ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে, কহে অশ্রুজলে—
'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান' না মণি তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।'—এত বলি নদী-নীরে ফেলিল মাণিক।

কবিতার মধ্য দিয়ে যে গল্পটি কবি ব'লতে চেয়েছেন তা কি ভাবে সরস ও সরল ভাবে অথচ সংক্ষেপে বলা যায় নিম্নে তার একটি নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। প্রথমেই দেখতে হবে গল্পটির প্রধান অংশ ও বিশেষ বিশেষ ঘটন কি ? সেগুলি নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

(১) সনাতনের পরিচয় ;

(২) অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের আগমন ;

(৩) সনাতনের উপরোধে ব্রাহ্মণেব পরিচয দান ও আগমনের কারণ বর্ণনা ;

(৪) তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ ও সনাতনের নিকট ব্রাহ্মণের ভিক্ষা প্রার্থনা ;

(৫) বহু চিন্তার পর ব্রাহ্মণকে স্পর্শমণি দান ;

(৬) ব্রাহ্মণের চৈতন্যের উদয় ও মণি বিসর্জ্জন।

এখন এই ঘটনাগুলি সরস ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত ক'রলে এরূপ দাঁড়ায় :—

বৃন্দাবনে যমুনাতটে ভক্ত সনাতন গোস্বামীর সাধনালয়। তিনি সর্ব্বদাই জপ-তপে রত। একদিন এক অপরিচিত ব্রাহ্মণের সেই আশ্রমে আবির্ভাব ঘ'টল। সনাতনের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের দিকে প'ড়ল। তিনি তার পরিচয় ও ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

তখন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয় দিয়ে ব'ললে যে পূর্ব্বে তার অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে এখন দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

তাই স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তাঁর নিকট আগমন ক'রেছেন।

সনাতন মনে মনে প্রমাদ গ'ণলেন। ভাবলেন তিনি ত সর্ব্বত্যাগী—তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে পারেন। এরূপ ভাবছেন—হঠাৎ তাঁর মনে বহুদিন পূর্ব্বে একটি কুড়িয়ে-পাওয়া মণির কথা মনে হ'ল।

তখন তিনি ব্রাহ্মণকে সেই মণির সন্ধান দিলে ব্রাহ্মণ তা গ্রহণ ক'রল। কিন্তু তার বিস্ময় আর বাধা মানে না। সেই মণি, সে যাতেই স্পর্শ করে তা-ই যে সোনা হ'য়ে যায়! তখন সনাতনের কথা চিন্তা ক'রে ব্রাহ্মণের চৈতন্যের উদ্রেক হ'ল। সে ভাবল যে, সনাতন এই অমূল্য মণিকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রেছেন, না জানি তিনি এ থেকে কত বেশী মূল্যবান মণির অধিকারী। তা ভেবে ব্রাহ্মণ সেই মণি যনমুার জলে বিসর্জ্জন দিল ও সেই অমূল্য সম্পদ-লাভের জন্যে সনাতনের চরণে লুটিয়ে প'ড়ল।

অনুচ্ছেদ-রচনা

প্রথমেই বলা উচিত অনুচ্ছেদ কাকে বলে। কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি যেমন বাক্য-রচনার প্রধান উপাদান, সেইরূপ কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি নিয়ে এক-একটি অনুচ্ছেদ গঠিত হয়। কিন্তু এই বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের একত্র সমাবেশ হ'লেই অনুচ্ছেদ হয় না।

কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে এই যথাযথ সমাবেশ সহজ হয়:—

(১) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হবে সে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রথমে গভীরভাবে চিন্তা ক'রতে হবে।

পরে একে একে সেই বিষয় সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ক'রতে হবে ও ভাব সঙ্কলন ক'রতে হবে, অর্থাৎ বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি সংগ্রহ ক'রতে হবে।

(২) পরে সেই তথ্যগুলি একটি ক্রমানুসারে সাজাবার পর কোন্‌টির পরে কোন্‌টি ব'সলে অনুচ্ছেদের বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভাবগুলি সহজভাবে পরিস্ফুট ক'রতে হবে।

(৩) সাধারণতঃ এক-একটি বিশেষ ভাবের জন্যে এক-একটি অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হয়। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি বিষয়ে কথোপকথনের সমস্ত অংশ প্রকাশিত হয়।

এই অনুচ্ছেদ-রচনায় দক্ষতা জন্মালে প্রবন্ধ-রচনা সহজ হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, **বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ থেকে প্রবন্ধে যেতে হয়।**

বর্ণশুদ্ধি

প্রত্যেক ভাষাতেই বানান নিয়ে কম-বেশী সমস্যা উপস্থিত হয়। বিশেষ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট বানান ভুল একটি রোগ বিশেষ। বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি বর্ণ আছে যেগুলির বৈশিষ্ট্য উচ্চারণকালে ধরা পড়ে না। যথা—ই ঈ, উ ঊ, জ য, ণ ন, শ ষ স। তাই এই বর্ণগুলি নিয়েই বেশী ভুল হয়।

এই ভুল কমাতে হ'লে যে শব্দটির প্রয়োগ হচ্ছে সেইটির মূল রূপের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বারংবার অনুশীলনই এই শুদ্ধি বিধানের প্রকৃষ্ট উপায় সত্য, কিন্তু কতকগুলি ভুল যে অসাবধানতাবশতঃই হ'যে থাকে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কি কি সাবধানতা অবলম্বন ক'রলে ও কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিলে এই বর্ণাশুদ্ধি কমানো যায়, তা নিম্নে আলোচিত হ'ল :—

১। শারীরিক—(শারিরীক) এখানে মূল শব্দ **শরীর**। সুতরাং এই শব্দটির দিকে দৃষ্টি রাখলে বর্ণাশুদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে। এরূপ, অতিথী—(অতিথি), কৃষিজিবী—(কৃষিজীবি), প্রতিকুল—(প্রতিকূল) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মূল শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। ণ ও ন, শ, ষ ও স সংক্রান্ত যে সমস্ত বর্ণাশুদ্ধি ঘটে ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান জানা থাকলে সেগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথা—বিষান—(বিষাণ); শ্বন—(শ্বণ); পরিস্কার—(পরিষ্কার)।

৩। আবার এমন কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি হয় যেগুলিকে বর্জ্জন ক'রতে হ'লে শব্দটি যে **ধাতু** হ'তে যে **প্রত্যয়-যোগে** নিষ্পন্ন হ'য়েছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) যথা—মতী—(মতি); অনুভূতী— অনুভূতি)।

[এস্থলে মূল ধাতু 'মন্' এবং 'ক্তি' প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন থাকলে বর্ণাশুদ্ধি হ'তে পারে না। কারণ 'ক্তি' প্রত্যয়ের মধ্যে কোথাও (ঈ) নেই।]

*(খ) সাধারণতঃ মনে রাখতে হবে **'ই' বর্ণযুক্ত 'ত' যখনই কোন পদের শেষে থাকবে** তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'তি' হ'য়ে থাকে। যথা—পতি, ক্ষতি, নতি, সুপ্তি, আসক্তি, আরতি ইত্যাদি।

* কিন্তু সরস্বতী, ভাগীরথী, কলসী, তরণী, রজনী ইত্যাদি স্থলে স্ত্রীবাচক 'ঈ' প্রত্যয় হ'য়েছে, তাই 'ঈ'-কারান্ত।

(গ) সাধারণতঃ পদের শেষে 'ইত' থাকলে সেগুলি 'ই'-কারান্ত হবে। যথা—উদিত, উদ্ভাসিত।

* (৪) আবার যেখানে পর পর ই ও ঈ থাকে, সেই স্থানে সাধারণতঃ **প্রথমে ই** ও পরে **ঈ** হয়। যথা—পূজারিণী, তটিনী ইত্যাদি।

অনুবাদ

অনুবাদ-শিক্ষার আগে অনুবাদ কি, অনুবাদ ক'রতে হ'লে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় সেদিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদের উপায় ও প্রকার ভেদ :—

প্রথমেই মনে জাগে অনুবাদ ব'লতে কি বুঝায়? কোন অংশকে একটি **ভাষা হ'তে অপর একটি ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ** বলে।

বর্ত্তমানে অনুবাদ-সাহিত্য বিশেষ সমাদর লাভ ক'রছে। কেবলমাত্র বাক্যের ও শব্দের ভাষাগত প্রতিশব্দ যোগালে অনুবাদ করা হ'ল না, যা'তে

মূল ভাবটি নষ্ট না হয়, অথচ ভাষার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে :—

Character plays an important part in the life of a man.—এর শব্দগত অনুবাদ ক'রতে হ'লে দেখা যায় যে, এর অনুবাদ হয়—

"মানুষের জীবনে চরিত্র একটি প্রয়োজনীয় অংশ খেলা করে।"

মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল প্রতিশব্দ যোগালে অনুবাদের এইরূপ **শোচনীয় পরিণতি ঘটে।** প্রকৃতই একটি ভাষার মধ্যে যে সমস্ত ভাব-সম্পদ নিহিত থাকে সে ভাষা অজানা হ'লেও অনুবাদের কল্যাণে তার প্রতিফলিত রূপ দেখতে পাই। অতএব অনুবাদের দায়িত্ব অনেকখানি।

অনুবাদ-পদ্ধতি জানতে হ'লে কত প্রকার অনুবাদ হ'তে পারে প্রথমে তা জানা দরকার।

মোটামুটি যে কয় প্রকারের অনুচ্ছেদ অনুবাদের জন্যে দেওয়া যায় তার স্বরূপ নিয়ে দেওয়া হ'ল :—

(১) **বর্ণনা-মূলক**—যার মধ্যে ভাবের বিশেষ সম্পর্ক নেই, এরূপ অনুবাদ ক'রতে হ'লে ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায রাখবার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখতে হয়—ভাবের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই। যথা—

The king Dasaratha had four sons named Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna. Rama was the eldest of four sons. From his boyhood he was very bold and dutiful.

রাজা দশরথের চারটি পুত্র ছিল। তাদের নাম ছিল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাদের মধ্যে রামচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বাল্যকাল হ'তে তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন।

(২) **ভাবকেন্দ্রিক**—এস্থলে কেবল শব্দগত অর্থের সাহায্যে ভাব প্রকাশ হয় না—ভাবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়।

এরূপ অনুবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা ক'রবার ইচ্ছা আছে।

এছাড়া ইংরাজী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এক-একটি ক'রে তাদের সন্নিবেশ ক'রছি।

*বাংলা অনুবাদের সময় সাধারণতঃ প্রথমে কর্ত্তা ও শেষে ক্রিয়া বসে। যথা—He sees the mor ning sun—সে প্রভাত-রবি দেখে।

(১) অনেকস্থলে ইংরাজীতে বাক্যের প্রথমে 'There' পদটির ব্যবহার দেখা যায়। সেস্থলে There-এর অর্থ সেখানে নয়; অনুবাদ ক'রবার সময় **একে বাদ দিয়ে অর্থ করতে** হ'বে। এজন্যে ইংরাজীতে একে Introductory there ব'লতে পারা যায়। যথা—

There lived a king named Janaka in Mithila—মিথিলায় জনক নামে এক রাজা বাস ক'রতেন।

(২) অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেক ইংরাজী বাক্যের পূর্ব্বে 'It' বসে। যথা—It rains. It was morning.

এসব স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় 'It'-এর অর্থ বাদ দিতে হবে।

It rains—'ইহা বৃষ্টি হ'চ্ছে' হবে না, 'বৃষ্টি হ'চ্ছে' হবে। It was morning—'ইহা প্রাতঃকাল ছিল' হবে না, 'তখন ছিল প্রাতঃকাল' হবে।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজী বাক্যের মধ্যে যেখানে Has বা Have আছে তার যে কর্ত্তা, বাংলায় তার সম্বন্ধপদ হ'য়ে যায়। যথা—He has a good pen—'সে একখানি ভাল কলম আছে' হবে না—'তার একটি ভাল কলম আছে' হওয়া উচিত।

(৪) বাংলা ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অধিক। সেজন্যে ইংরাজী বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া একটির অধিক থাকলে বাংলা অনুবাদের সময় প্রধানটিকে রেখে অবশিষ্টগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া করাই উচিত। যথা—Come here, take your seat and read—এখানে এসে বসে পড়াশুনা কর।

(৫) তাছাড়া ইংরাজী ভাষায় বাংলা অপেক্ষা অধিক **মিশ্র বাক্যের** প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলা অনুবাদের সময় এই সমস্ত মিশ্র বাক্যগুলিকে **ভেঙ্গে ছোট ছোট সরল বাক্যে** প্রকাশ করা উচিত। যথা—Shyamlal,

who is my friend, came here yesterday—শ্যামলাল কাল এখানে এসেছিল। সে আমার বন্ধু।

(৬) বাংলায় Passive voice-এর ব্যবহার খুব কম ; সেজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজীতে যা Passive voice-এ আছে তাকে বাংলায় Active voice-এ অনুবাদ ক'রলেই ভাল শোনাবে। যথা—The dog is beaten—কুকুরটি মার খাচ্ছে। He has been informed by me—আমি তাকে জানিয়েছি।

(৭) ইংরাজীতে প্রায় Let বা May এইরূপ শব্দ আসে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'Let'-এর প্রতিশব্দ 'দাও', বা 'May'-এর প্রতিশব্দ 'পারে' বা 'পাবি' ব্যবহার করা উচিত নহে। ক্ষেত্র অনুসাবে তাব যথাযথ অর্থ খুঁজতে হবে। যথা—

Let me have a walk—একটু বেড়িয়ে আসি ('আমাকে বেড়াতে দাও' নহে)।

May God bless him—ভগবান তার মঙ্গল করুন ('ভগবান তাব মঙ্গল ক'রতে পারেন' নহে)।

রচনা-শিক্ষা

আগেই ব'লেছি, ভাষা ও সাহিত্য পবস্পব পবিপোষক। ভাষা সাহিত্য উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, আব সাহিত্য ভাষাব সার্থকতা প্রতিপন্ন করে।

অনুভূতি ও প্রকাশ সাহিত্যের দুটি দিক। এই দুটি দিকই যাতে পবিপুষ্ট হয় সেজন্যে রচনাব যথেষ্ট উপযোগিতা।

রচনা ভিন্ন স্তরেব। আজকাল বস-বচনা, বম্য-বচনা, নিবন্ধ-বচনা ও এমনি আরও কত প্রকার রচনার সাথে পবিচিতি ঘটে। কিন্তু রচনাব গোড়ার কথা হ'ল—ভাব ও ভাষার মধ্যে সংহতি-স্থাপন। আব কি ক'বে এই সংহতি আসে সে সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকগণ কয়েকটি সূত্র পেয়েছেন। যেমন সম্বন্ধ-সূত্র।

পর্য্যবেক্ষণ, মনোযোগ ও স্মৃতি বিষয়-বস্তু ও চিন্তার মধ্যে যোগসূত্রে বচনাব পথে সহায়তা করে।

রচনা-শিক্ষার ভিন্ন স্তর :—

নানা ভাবে রচনা-শিক্ষার পথে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা যায়। মুখে মুখে বাক্য-রচনা শেখানোর রীতি শৈশবে বিশেষ উপযোগী। কোন গল্প শুনে বা প'ড়ে তাকে ভিত্তি ক'রে শিশুকে গল্পটি নিজের ভাষায় ব'লতে বলা হবে। অনেক সময় কোন ছবি দেখিয়ে মুখে মুখে কথা সম্প্রসারণ ক'রতেও বলা যায়।

নানা ভাবে রচনার পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেওয়া যায়। সংক্ষিপ্তকরণ, সারাংশ-লিখন যেমন শিক্ষার্থীর নির্ব্বাচনীশক্তি ও স্মৃতিশক্তিকে উজ্জীবিত করে, ব্যাখ্যা, ভাব-সম্প্রসারণ তেমনি কল্পনা ও প্রকাশকে সমৃদ্ধ করে।

সংক্ষিপ্তকরণ, সারাংশ-লিখন বা মর্ম্মার্থ-প্রকাশ প্রায় একজাতীয়। কারণ যুক্তিবোধ ও বিচার-বুদ্ধি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আর ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চাই বিষয়-বস্তুর উপলব্ধি ও তার বিশেষ বিশেষ অংশের আলোচনা। তবে ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণ এক জিনিস নয়। আর প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে সব-কিছুরই সমন্বয় দরকার। তাই একে একে সবগুলি পর্য্যায়েরই আলোচনার অবকাশ আছে।

সারাংশ-লিখন : সারাংশ-লিখনের জন্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়-বস্তু উপলব্ধি ক'রে তার মূল বক্তব্যকে প্রকাশ ক'রতে হবে। তাই সারাংশ-লিখনের মাধ্যমে উপলব্ধি, নির্ব্বাচন, যুক্তি ও প্রকাশ এই সব শক্তির বিকাশ ঘটে।

সারাংশ-লিখনে অভ্যস্ত হ'লে শিক্ষার্থী রচনার কাজেও অগ্রসর হ'তে পারে।

অনেক পরীক্ষায় সারাংশ-লিখনের স্থান আছে। তাই সারাংশ-লিখনকে সার্থক ক'রতে হ'লে প্রথমেই বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বারংবার বিষয়কে প'ড়তে হবে ও তা থেকে সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রতে হবে। পঠিতাংশের মধ্যে কোন্ কোন্ মূল ভাবকে কেন্দ্র ক'রে বিষয়-বস্তু গ'ড়ে উঠেছে তা পৃথকভাবে অন্য কোন স্থানে লিখে রাখতে পারলে ভালো হয়। তারপর প্রত্যেক সঙ্কেত-সূত্রকে কেন্দ্র ক'রে দুই-এক অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হবে যাতে বক্তব্য বিষয়ের সংহত প্রকাশ ঘটে। সাধারণতঃ সপ্তম শ্রেণী থেকে সারাংশ-লিখনের জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

ভাব-সম্প্রসারণ : ভাব-সম্প্রসারণ ক'রতে হ'লে যেমন পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন কল্পনার। কোন ভাববস্তুকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশঃ তার বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। তাই ভাব-সম্প্রসারণ প্রবন্ধ-রচনার সহায়ক হয়।

অনেক সময় ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। মূল ভাবকে অনুসরণ ক'রতে না পেরে কোন গৌণ ভাবকে নিয়ে অনেকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাই বিষয়-বস্তুকে বারংবার আবৃত্তি ক'রে তা থেকে মূল ভাবকে আহরণ ক'রতে হবে। তারপর সেই ভাবকে ঘিরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। সাধারণতঃ ভাব-বিশ্লেষণ ক'রতে হ'লে চাই পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধি, তাই নিম্ন শ্রেণীতে ভাব-সম্প্রসারণ খুব উপযোগী নয়।

ব্যাখ্যা, ভাব-সম্প্রসারণ ও প্রবন্ধ-রচনা প্রায় একজাতীয়। কোন বিষয় বা ভাবকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করা ও অনুভূতি থেকে ক্রমশঃ ভাষায় রূপ দেওয়াই হ'ল শিক্ষার্থীর কাজ। মূল ভাবকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তারই সূত্র ধ'রে ব্যাখ্যা করাই হ'ল ভাব-সম্প্রসারণ। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয় বিশ্লেষণ ক'রতে সহায়তা ক'রতে হবে ও তার পর ক্রমশঃ এক-একটি ভাবকে নিয়ে পর্য্যালোচনা ক'রতে হবে। কোন অলঙ্কার থাকলে তার ব্যাপক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। প্রথমতঃ কয়েকটি আদর্শ শিক্ষার্থীর সামনে রাখলে বোধ হয় তা কার্য্যকরী হ'তে পারে। যে-কোন প্রবন্ধ-রচনার পক্ষে এগুলির উপযোগিতা যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যাকে সাধারণতঃ তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়—প্রসঙ্গ, বিষয়-বস্তুর আলোচনা ও টীকা যোজনা। বিষয়-বস্তুকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যেই প্রসঙ্গ-আলোচনার সার্থকতা। আর প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিষয়-বস্তুর আলোচনা ক'রতে হবে।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে লেখকের ভাব কিভাবে প্রতিফলিত, একে একে তার উদ্‌ঘাটন করাই হবে ব্যাখ্যাকারের প্রকৃত কাজ। বাক্যের মধ্যে নিহিত ভাবের সহজ প্রকাশই হ'ল ব্যাখ্যা।

এখন প্রশ্ন হ'ল ব্যাখ্যা ক'রব কি ক'রে? কতটুকু ব'ললে লেখকের বক্তব্যটি সহজে বোধগম্য হয়? কারণ লেখক অনেক সময় প্রতীক-ব্যঞ্জনার মাধ্যমে অল্পকথায় চিন্তাকে রূপ দেন। তাই ব্যাখ্যাকার লেখক আর পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ক'রবেন।

এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা ক'রতে শেখাতে হ'লে তাকে ব'লতে হবে ব্যাখ্যার তিনটি অংশকে অবলম্বন ক'রে একে একে ভাব পরিস্ফুট ক'রতে। তার পর শেষে বাক্যের জটিল অংশগুলিকে টীকার আকারে প্রকাশ ক'রতে হবে। মোট কথা প্রথমে প্রসঙ্গ-আলোচনা, তারপর ব্যাখ্যার অন্তর্গত অংশের পরিস্ফুটন ও জটিল অংশের বিশ্লেষণ এবং শেষে কোন বিশিষ্ট শব্দকে টীকার আকারে প্রকাশ করা ব্যাখ্যার তিনটি পর্য্যায়। ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে অনেক সময় শব্দের চেয়ে বাক্যের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। তা না হ'লে সামগ্রিক অর্থবোধ হবে না।

প্রবন্ধ-রচনা : ব্যাখ্যার মতো প্রবন্ধেরও তিনটি পর্য্যায় আছে—প্রস্তাব, প্রতিপাদন ও উপসংহার।

প্রবন্ধের মূল কথা হ'ল বিষয়-বস্তু ও ভাব-বিন্যাস। বিষয়-বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি না থাকলে প্রস্তাব-অংশ ঠিকভাবে লেখা যায় না। প্রবন্ধ হ'ল যুক্তি-কেন্দ্রিক। তাই ভাব-সম্প্রসারণের চেয়ে প্রবন্ধ আরও সতর্ক রচনা। প্রবন্ধ-রচনার ভিন্ন দিক আছে। পর্য্যবেক্ষণ ও স্মৃতি প্রবন্ধ-রচনায় বিশেষ সহায়ক।

নানা রকমের প্রবন্ধ হ'তে পারে। কোনটি বর্ণনামূলক, কোনটি অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিকেন্দ্রিক, আবার কোনটি বা চিন্তামূলক ও যুক্তিকেন্দ্রিক। বিষয়মূলক প্রবন্ধ-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই শিক্ষার্থীকে সহজ থেকে কঠিনের দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে শিক্ষকের কাজ।

প্রবন্ধ-রচনা

কোন একটি প্রাণী, ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান বা ভাবকে অবলম্বন ক'রে কতকগুলি বাক্য রচনা করার নামই **প্রবন্ধ-রচনা**। প্রবন্ধ-রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত :—

প্রথমতঃ দেখতে হবে প্রবন্ধটি কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে।

(ক) কোন **প্রাণি-বিষয়ক** প্রবন্ধ হ'লে প্রথমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা ক'রতে হবে :—

(১) আকৃতি, (২) প্রকৃতি, (৩) খাদ্য, (৪) প্রাপ্তিস্থান, (৫) উপকারিতা ও অপকারিতা।

(খ) কোন **বস্তু-বিষয়ক** প্রবন্ধ লিখতে হ'লে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা ক'রতে হবে :—

(১) বস্তুটির রূপ, (২) উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, (৩) প্রাপ্তিস্থান, (৪) উপকারিতা ও অপকারিতা, (৫) উপসংহার।

(গ) ব্যক্তি-বিষয়ক—

(১) জন্মস্থান ও বংশ-পরিচয়, (২) ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত, (৩) তাঁর কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব, (৪) জনসমাজে তাঁর অবদান, (৫) ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে তাঁর চরিত্র ও আদর্শ, (৬) উপসংহার।

(ঘ) ঘটনা-বিষয়ক—

(১) বিশেষ বিশেষ ঘটনা, (২) স্মরণীয় ব্যাপারের সন্নিবেশ, (৩) উপসংহার।

(ঙ) স্থান-বিষয়ক—

(১) (ভৌগোলিক) অবস্থিতি, (২) প্রাকৃতিক বিবরণ, (৩) যাতায়াতের উপায়, (৪) অধিবাসীর সংখ্যা, জাতি, ব্যবসায় ইত্যাদি, (৫) উৎপন্ন দ্রব্য, (৬) স্থানীয় বিশেষত্ব, (৭) প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য, (৮) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(চ) ভাবমূলক প্রবন্ধ—এ বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

আলোচিত পন্থা অবলম্বন ক'রে রচনার বিষয়টিকে **সহজ ও সরল** ভাবে প্রকাশ ক'রতে হবে। যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে প্রথমেই তার **মোটামুটি পরিচয় দেওয়া উচিত।** রচনাটিকে **অবান্তর কথায় পূর্ণ করা উচিত নয়।** কারণ প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ক'রলেই রচনা সুন্দর ও সার্থক হয় না। **ইহা তথ্যপূর্ণ অথচ সরস হওয়া উচিত।**

রচনার মধ্যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রতে হ'লে তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

নিয়মিত অনুচ্ছেদে সমস্ত প্রবন্ধটি বিভক্ত হওয়া উচিত এবং একটি **নির্দ্দিষ্ট ধারা** অবলম্বন ক'রে যে প্রবন্ধটি রচনা ক'রতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সচেতন ক'রতে হবে।

প্রবন্ধটির মধ্যে যাতে **সাধু ও অসাধু ভাষার মধ্যে মিশ্রণ না হয়,** সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রত্যেক সঙ্কেত-বাক্যকে অবলম্বন ক'রে যে সমস্ত অনুচ্ছেদ রচিত হবে **সেগুলি যেন সুসামঞ্জস ও সংক্ষিপ্ত হয়,** যেন কোন **একটি অনুচ্ছেদ অতিদীর্ঘ বা অতিসংক্ষিপ্ত না হয়।**

* * মোট কথা সামঞ্জস্য, ভাষার সরলতা, তথ্যপূর্ণতা ও সঙ্কেত-বাক্যের যথাযথ বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে প্রবন্ধ সার্থক হ'য়ে উঠবে।

রচনা ও রচনার প্রধান দোষ

বাক্য-রচনায় সাধারণতঃ কতকগুলি দোষ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু একটু সতর্কতা অবলম্বন ক'রলে সেই দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথা—

(ক) বাক্যের মধ্যে সাধু ও অসাধু শব্দের সংমিশ্রণ অর্থাৎ সাধু ও চলতি শব্দের প্রয়োগ একই বাক্যের মধ্যে হওয়া উচিত নয়। এই দুই প্রকার ভাষা মেশালে যে দোষ হয়, তা ভাষার সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে। যথা—গ্রাম্য মাঠের মাঝখানে একখানি পর্ণ কুঁড়ে। এস্থলে হওয়া উচিত ছিল—গ্রাম্য প্রান্তরের মধ্যে একখানি পর্ণকুটীর।

(খ) একই কথা রচনার মধ্যে বারবার লেখা উচিত নয়। এতে **পুনরাবৃত্তি** দোষ ঘটে। এটি রচনার মধ্যে একটি প্রধান দোষ। যথা—গরু চতুষ্পদ জন্তু। গরুর চারটি পা আছে। এরা তৃণভোজী পশু। এরা ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করে।

(গ) কোন রচনা লিখতে হ'লে বিষয়ের বাইরে কোন **অবান্তর কথা** লেখা উচিত নয়। 'গরু' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি কৃষকদের সম্বন্ধে

অনেকগুলি বাক্য রচনা করা হয় এবং যদি এর সঙ্গে গরুর কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে এটি রচনার একটি প্রধান দোষরূপে গণ্য হবে।

(ঘ) রচনার প্রধান গুণ হ'চ্ছে ভাব-বিন্যাস। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব রচনার মধ্যে প্রকাশ ক'রতে হবে তাদের একটি ধারা অবলম্বন ক'রে সাজাতে হবে। নতুবা ভাবগুলিকে ছড়িয়ে ফেললে রচনা সুন্দর হয় না।

গরু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি আমরা প্রথমে গরুর উপকারিতা সম্বন্ধে বলি, তার পরে তার আকৃতি এবং অপকারিতার কথা লিখি, তা হ'লে প্রবন্ধটি ত্রুটিপূর্ণ হবে।

(ঙ) প্রায় দেখা যায় যে, এক-একটি বাক্য অতি দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে—অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যকে অত্যন্ত দীর্ঘ ক'রে ফেলা হয়। এটি রচনা-রীতির একটি বিশেষ দোষ। এক্ষেত্রে বাক্যাংশগুলিতে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ ক'রে পৃথক পৃথক বাক্যে পরিণত করা উচিত। যথা—

সুভাষচন্দ্র প্রথমে বার্লিনে গিয়ে সেখান থেকে জাপানে আসার পরে সিঙ্গাপুরে এসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেন ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আবির্ভূত হ'য়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম ক'রেছিলেন। বাক্যটি অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কারণ বাক্যটির মধ্যে এত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা হ'য়েছে যে, ইহা অনর্থক দীর্ঘ হ'য়ে প'ড়েছে।

(চ) এরূপ 'ও' বা 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের বাক্যাংশের মধ্যে বারংবার প্রয়োগ ঘটলে বাক্য শ্রুতিকটু হয়। যথা—গরু গৃহপালিত জন্তু ও উপকারী প্রাণী এবং অত্যন্ত নিরীহ জীব এবং হিন্দুগণের দেবতাস্থানীয়।

গল্প-রচনা

গল্প রচনা ক'রবার জন্যে ছাত্রদের বাল্যকাল থেকে শিক্ষা করা উচিত, কারণ রচনা-শিক্ষার এটি একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমে কোন গল্প শুনে বা প'ড়ে তা নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ ক'রতে হ'লে প্রথমেই গল্পের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি বেছে নিতে হবে। এই সঙ্কেত-বাক্য-গুলিকে ঠিক ক'রতে হ'লে গল্পটির বারংবার আলোচনার প্রয়োজন। একটি

গল্প শু'নে নিজে ব'লবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে রচনার অধিকার জন্মে, ক্রমশঃ নিজের মতন ক'রে সাজাবার ক্ষমতা আসে।

যে সঙ্কেত-বাক্যগুলির কথা বলা হ'য়েছে সেগুলি ঠিকভাবে সাজিয়ে নিয়ে সরলভাবে প্রকাশ ক'রবার চেষ্টা করা উচিত। তা হ'লে প্রয়োজনীয় অংশ বাদ প'ড়বার সম্ভাবনা থাকে না।

গল্প-রচনা বিষয়ে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে :—

(ক) গল্পের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য রাখতে হবে, অর্থাৎ যাতে গল্পটি একঘেয়ে না হ'য়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) গল্প-রচনায় ভঙ্গিটি সরস ও সুন্দর ক'রতে হবে।

(গ) গল্পটিকে ধীরে ধীরে প্রকাশ ক'রতে হবে, যেন পাঠক-মহলের মনে সর্ব্বদাই কৌতূহল জেগে থাকে।

(ঘ) গল্পের মধ্যে অবান্তর ঘটনার বর্ণনা করা উচিত নয়। তবে গল্পটিকে সরস ও সুস্পষ্ট ক'রবার জন্যে যদি পটভূমিকার প্রয়োজন হয়, তারও আয়োজন ক'রতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা

এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, পৌরনীতি ও এমনি সব বিষয়-বস্তু আমাদের বিদ্যালয়ে পৃথকভাবেই পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই একটি স্বতন্ত্র গণ্ডী ছিল। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি থাকলে বোধ হয় শিক্ষা বেশী সার্থক হ'য়ে ওঠে। তাই সমাজের কথা বা সমাজ-বিজ্ঞান (Social studies) এরূপ একটি বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে যাতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠবে, বিচার-বুদ্ধি ও বাস্তবজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতির ফলে সামগ্রিক দৃষ্টি গ'ড়ে তোলাই হ'ল এর লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-চেতনা মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক-বোধকে জাগিয়ে দেওয়া এই বিষয়ের অন্যতম দায়িত্ব। শুধু তাই নয় যাতে গোড়া থেকে বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ-জীবনের সাথে কোন শিক্ষার্থী গোড়া থেকেই মানিয়ে চ'লতে শেখে, যাতে সে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হ'য়ে উঠতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি রেখে এই বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে। তাই এই বিষয়ের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। জীবন জুড়েই এর বিস্তৃতি। শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশই এর চরম লক্ষ্য। জীবনের সাথে তাই এই বিষয়ের নিবিড় যোগাযোগ। তাই জীবনের বাস্তব-পরিস্থিতি ও সমস্যাকে ঘিরেই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা।

পাঠ্য-তালিকায় সমাজ-বিজ্ঞানের স্থান ঃ—

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এই নূতন বিষয়-বস্তুর বিশেষ স্থান আজ আমাদের দেশেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে কি কি বিষয় নিয়ে এর পাঠ্যসূচী প্রণীত হবে এ বিষয়ে নানা মত আছে। তবে আমেরিকা প্রভৃতি যে-সব দেশে এই বিষয় বেশ কিছুদিন হ'ল প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, তাদের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এমন বিষয়-বস্তু ঠাঁই পেয়েছে যাকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় না। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা থেকে তথ্য আহরণ ক'রে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বিন্যাস করাই এই বিষয়ের

লক্ষ্য। তাই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞানের সব-কিছুর গণ্ডীকে সরিয়ে দিয়ে সমাজ-বিজ্ঞান মূলতঃ সমস্যা ও মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে ভিত্তি ক'রেই প্রণীত হবে।

সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্ত্তনের লক্ষ্য

সমাজ-বিজ্ঞান পাঠনের লক্ষ্য আজ কেবল শিক্ষার্থীর তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলাই হ'ল সমাজ-বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, কমনীয় সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধন করাই হ'ল তাই এর অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে সহায়তা ক'রতে হ'লে তাই সামাজিক চেতনারও উন্মেষসাধন ক'রতে হবে। তা না হ'লে পুঁথিগত শিক্ষা আজ দেশের বিশেষ কোন কাজে লাগছে না।

দেশের চারিদিকে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা-সমাকীর্ণ পথে চ'লতে হ'লে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হ'তে হবে। তাই শিক্ষার্থীর মনে গোড়া থেকেই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি জাগিয়ে দেওয়া এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পা ফেলতে শেখানো সমাজ-বিজ্ঞানের বিশেষ উদ্দেশ্য।

তাছাড়া সামাজিক কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, প্রতিবেশী, দেশবাসী ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যে সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্ত্তনের সার্থকতা আছে। আজ চারিদিকে হানাহানি, মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তাই কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীর মন যদি মানবিক আদর্শে গঠন করা যায়, তবে তার উপযোগিতা যথেষ্ট।

এক কথায় বলা যায় যে, যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলাই হ'ল সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার সোপান হ'ল স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা, জগতের ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সম্পর্কে জ্ঞান ও বিশ্বমানবের মধ্যে সম্পর্কবোধকে উদ্দীপিত করা।

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী ও পাঠন-পদ্ধতি

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী নির্দ্দিষ্ট হ'লেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার প্রয়োজন। তাই পাঠ্য-বিষয়কে বিশ্লেষণ ক'রে প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তুকে নিয়ে নানা ভাবে দেখবার ও আলোচনা ক'রবার অবকাশ দিতে হবে। তাই কয়েকটি বস্তু-এককে ভাগ ক'রে নিতে পারলে বোধ হয় সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তু এক-একটি প্রশ্নকে ঘিরে গ'ড়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় পরিবেশ কি ভাবে খাদ্য-আহরণের পথে সহায়তা করে? এই প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাব, জলবায়ু, কৃষিজাত দ্রব্য, আঞ্চলিক সংস্কার ও লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস ও তার উপযোগিতা, স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, খাদ্যের আমদানী-রপ্তানী, উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ পদ্ধতি—সব-কিছুই আলোচনা করা যেতে পারে। এই নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলেব ও দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজ—সকলের মধ্যেই একটি সংহতি আনতে হ'লে কেবল শিক্ষার্থীকে তথ্য পরিবেশন ক'রলে চ'লবে না। কখনও একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য আহরণের কাজ শিক্ষার্থীর ওপরই ন্যস্ত ক'রতে হবে, আবার কখনও দলগত কাজের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, যাতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজের বিভিন্ন লোক পরস্পর সহযোগিতা স্থাপন ক'রে শিক্ষার পথে এগিযে যেতে পারে। তাই কার্য্য-সমস্যা-পদ্ধতি ও আলোচনা-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে এই সব পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয়সাধন ক'রতে হবে। কখনও বক্তৃতা, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া, উদাহরণ দেওয়া, অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ, আলোচনা ও পরিচালনা পাঠনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌখিক আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ, কার্য্য-সমস্যা, দলগত কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠন কার্য্যকরী হ'তে পারে।

পাঠ্যবস্তুকে কয়েকটি এককে বিশ্লেষণ ক'রে নিয়ে তার পাঠনের উপযোগী পদ্ধতি, প্রণালী, শিক্ষার উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপের কথা চিন্তা ক'রতে হবে।

উদাহরণ ১।

(১) পাঠ্যবস্তু	(২) পদ্ধতি	(৩) শিক্ষা-প্রণালী	(৪) উপকরণ	(৫) শ্রেণীর কার্য্যকলাপ
১। নদীমাতৃক সভ্যতা	১। বর্ণনা ২। গোষ্ঠীগত আলোচনা ৩। শিক্ষার্থীদের তথ্য আহরণ	১। মৌখিক উদাহরণ ২। আলোচনা ৩। শ্রেণী বা বাড়ীর কাজ	ছবি, মডেল, তালিকা, নক্সা, আলোক-চিত্র ইত্যাদি।	১। যাদুঘর পরিদর্শন ২। মডেল প্রণয়ন ৩। পুস্তিকা প্রণয়ন

উদাহরণ ২।

(১) পাঠ্যবস্তু	(২) পদ্ধতি	(৩) প্রণালী	(৪) উপকরণ	(৫) কার্য্য
খাদ্য	কার্য্য-সমস্যা-পদ্ধতি বর্ণনা	ভ্রমণ সংবাদপত্র-পাঠ	চার্ট, ম্যাপ, ছবি, নক্সা, তথ্যাবলী	মডেল, চার্ট ইত্যাদি তৈরী করা

উদাহরণ ৩।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা	কার্য্য-সমস্যা-পদ্ধতি দলগত কাজ	পর্য্যবেক্ষণ	বই, ফিল্ম, চার্ট	চার্ট ও তালিকা প্রণয়ন করা

স্থানীয় সমাজ-জীবনের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ক'রতে হ'লে চাই—

(ক) স্থানীয় পরিবার-জীবনের পরিচয়-লাভ।

(খ) জলবায়ু, আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ ও তার বিবরণী সংগ্রহ।

(গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৃত্তি ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণ।

(ঘ) বাণিজ্য ও বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা।

(ঙ) প্রাদেশিক যানবাহন ও সংবাদকেন্দ্র পরিদর্শন।

(চ) লোকসংখ্যা ও ক্ষেত্রের অনুপাত নির্ণয়।

কার্য্যাবলী ঃ

(১) স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে নানা তথ্য আহরণ ক'রতে বলা হবে। গ্রামের মন্দিব ও দেবালয, হাট, ডাকঘর ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার্থীরা ছবি ও নক্সা আঁকবে এবং নানা তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখবে। এ ছাডা স্থানীয় নৃত্য উৎসব প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির দিকে সচেতন হবে। এ ছাড়া কাছাকাছি কোনও সরকারী দপ্তর থাকলে তা দেখে এরা তথ্য আহরণ ক'রবে।

নানা ভাবে কর্ম্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। পল্লী বা নগরীকে কেন্দ্র ক'রেও তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। যেমন—

১। কোন নগরের ইতিহাস সংগ্রহ করা।

২। নগরের বিভিন্ন বিশিষ্ট অধিবাসীর সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা।

৩। নগরের বিবর্ত্তন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়।

৪। নগর পরিচালনার ব্যবস্থা, নাগরিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।

৫। শহরের জলসরবরাহ, যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ।

৬। শহরের অধিবাসীদের বৃত্তি ও বর্ণ-বিভাগ—স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

তেমনি পল্লীতেও শস্য উৎপাদন ও কুটীরশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সহজ। পল্লী-পরিবেশেও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আগেই

ব'লেছি যে কয়েকটি ছোট ছোট এককে ভাগ ক'রেও সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

বিষয়ঃ (ক) স্থানীয় পরিবেশে জীবনযাত্রা—

এই বিষয়-এককটিকে নানা ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়।

যেমন—খাদ্য—পরিধেয়—বাসস্থান প্রভৃতি।

পদ্ধতি—

(১) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে প্রসঙ্গটির উত্থাপন ক'রতে হবে।

(২) নানা ধরণের কার্য্যাবলীর প্রবর্ত্তন ক'রতে হবে।

(৩) অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৪) বিষয়-বোধকে স্পষ্ট ক'রতে হবে।

এক-একটি একককে আবার নানাভাবে সাজানো যায়। যেমন খাদ্যকে কেন্দ্র ক'রে নানা প্রসঙ্গের বিন্যাস ও প্রশ্নের উত্থাপন করা যায়। যেমন—

খাদ্য সরবরাহ, স্থানীয় পরিবেশে খাদ্যের উৎপাদন, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি।

শ্রেণীর জন্য প্রশ্নাবলী

(ক) **প্রশ্নাবলীর নমুনা ঃ**

১। আমাদের খাদ্য সরবরাহের উৎসগুলি কি কি ?

২। ধান্য উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা কি কি ?

৩। ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্য কি কি ?

৪। দেশের শতকরা কত অংশ কৃষিকার্য্যে লিপ্ত ?

৫। আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ?

৬। কিভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা যেতে পারে ?

(খ) **কার্য্যাবলী :**

জ্ঞান আহরণের জন্যে শিক্ষার্থীদের নানা কাজ ক'রতে বলা যায়। গৃহস্থালীর খাদ্য কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে অভিভাবক, ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ ক'রে,

বা বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষার্থীরা তথ্য আহরণ ক'রতে পারে। তারপর তারা একটা সমিতি গঠন ক'রে আহৃত তথ্যের ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ ক'রতে পারে।

সমাজ-বিজ্ঞান পাঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য

আগেই বলা হ'য়েছে যে, সমাজ-বিজ্ঞান পড়াবার সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিষয়-বস্তু ও পরিবেশের কথাও চিন্তা করার প্রয়োজন। প্রয়োজন বুঝে এই পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে হবে। কোন বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এই বিষয়ের পাঠন সার্থক হ'তে পারবে না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, গতানুগতিক শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানকে আবদ্ধ রাখলে চ'লবে না। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সহযোগিতা না হ'লে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই কখনও ভাষা ও বর্ণনা, আবার কখনও আলোচনা, উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য ও নানা শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার প্রবর্ত্তন এই বিষয়টিকে সরস ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে পাবে। যে যে পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে অবলম্বন করা যেতে পারে, তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আছে। যেমন—

বর্ণনামূলক—এই পদ্ধতি চিবাচরিত হ'লেও তথ্য পরিবেশনের পক্ষে এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না।

কার্য্য-সমস্যা-পদ্ধতি—এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কোন কাজ ক'রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রতে হয়। যেমন—কোন গ্রামের হাট লক্ষ্য ক'রে তা থেকে আঞ্চলিক উৎপাদন বিষযে তথ্য আহরণ করা—বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা।

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা

আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানেব যে পাঠ্য-তালিকা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তা বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক। তার মধ্যে তাই স্থান পেয়েছে—স্থানীয় পরিবেশ ও জনসমাজ, বিশ্বের নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাত্রা। পাঠ্যসূচীর বৈচিত্র্যের জন্যে নানা বিদ্যালয়ে নানা ভাবে সমাজ-বিজ্ঞান পড়ানো হ'চ্ছে।

এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বিষয়-বস্তু নিয়ে পাঠন সুরু হ'য়েছে। কোন বিদ্যালয় স্থানীয় পরিবেশ, কোন বিদ্যালয় বা সামাজিক কর্ত্তব্য ও আচরণ নিয়ে পাঠন সুরু ক'রেছে। কোথাও বা খাদ্য ও খাদ্য-সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে, আবার কোথাও বা বাসস্থান নিয়ে। মোট কথা সমাজ-শিক্ষা পাঠনের আজও কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা উদ্ভাবিত হয়নি, কারণ পরীক্ষামূলকভাবে তা সুরু হ'য়েছে।

পাঠ্যসূচীর নমুনা

স্থানীয় সমাজ-জীবন :

(ক) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও তা মেটাবার আয়োজন—ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির প্রভাব। আহার্য্য—বাসস্থান—বেশভূষা।

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য—জল-সরবরাহ—পরিচ্ছন্নতা ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা।

ব্যাধি ও ব্যাধির দূরীকরণ—আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন—নানা প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও রক্ষার উপায়—সমাজের নানা অপরাধ ও তার নিবারণের উপায।

(গ) কিভাবে সমাজ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটায়—সমাজের কৃষি, শিল্প ও কৃষ্টিগত কার্য্যকলাপ।

বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি।

পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ও বাহির বিশ্ব। ব্যবসায়-বাণিজ্য—যানবাহন, কার্য্য-নিয়োগ ও তাব ব্যবস্থা।

প্রাচীন জন-গোষ্ঠী ও সভ্যতার কথা :

(ক) প্রাচীন জন-সমাজের পত্তন—আদিম উপকরণ ও বৃত্তি—শাসন-ব্যবস্থা—পরিবার-গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক অধিবাসী।

(খ) নদীমাতৃক সভ্যতা—মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা—সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও জনকল্যাণ।

(গ) গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—মানব-সমাজে তাদের অবদান।

(ঘ) আর্য্য সভ্যতার উত্থান-পতন।

(১) বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ—তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন—জাতিভেদ ও তার ফলাফল—শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

(২) জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, অশোকের রাজত্বকাল, মৌর্য্য সভ্যতা, গুপ্ত-রাজত্ব। ভারতীয় সংস্কৃতি—ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার।

(৩) সুলতান ও মোগল শাসনকালে ভারতীয় জীবন, সাহিত্য ও কলা।

(৪) ভারতে ইসলাম ধর্ম্মের প্রসার ও তার প্রভাব। মধ্যযুগের ধর্ম্ম—ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কার। জাতীয় সংগঠনের পথে মোগল সম্রাট ও তাঁদের অবদান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাঁদের প্রভাব। শিক্ষা—শাসন, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি।

বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠী : যেমন—

(ক) মালয়ের সমাজ-গোষ্ঠী—সেখানকার উপজাতি অঞ্চল—তাদের জীবন-যাত্রা—কৃষি, শিকার ও নানা বৃত্তি।

(খ) পশ্চিম অষ্ট্রেলিযার সমাজ-গোষ্ঠী—অষ্ট্রেলিযার উপজাতিদের জীবন-যাত্রা। মরু-অঞ্চল—খনিপ্রধান নগরের অভ্যুত্থান। যানবাহনের সমস্যা—পানীয় ও খাদ্য সরবরাহ।

আরবের বেদুইন-গোষ্ঠী—ইজিপ্টের বেলালিন।

(গ) চীন দেশের সমাজ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কৃষক—উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা—নয়াচীন ও তার বিবর্ত্তন।

(ঘ) ইস্রাযেলেব ইতিহাস—জু'দের আগমনের পর কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি—সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন।

(ঙ) ইতালী ও স্পেনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা—ডাচ সমাজের ইতিহাস।

(চ) রাইনল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর কথা। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য—যুদ্ধের প্রভাব।

(ছ) আর্জ্জেন্টিনা ও আমেরিকার তুলনামূলক আলোচনা।

(জ) সেন্ট লরেন্স ও তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা। ভারত ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য।

(ঝ) সাইবেরিয়ার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য—আধুনিক পরিস্থিতি।

বর্ত্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা :

(ক) পশ্চিমের প্রভাব—মধ্য-প্রাচ্যের বিবর্ত্তনের ইতিহাস।

(খ) গ্রেট বৃটেনে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান—ফরাসী বিপ্লব ও তার প্রভাব—শিল্পগত বিপ্লব।

ভারতীয় সভ্যতার ওপর পশ্চিমের প্রভাব :

(ক) বৃটিশ শাসনের ইতিহাস। বণিক ইংরাজের আগমন ও ভারত-শাসনের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ। মোগল, মারাঠা ও ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। ১৮৫৭ সালের ঘোষণা।

(খ) ভারতের ইতিহাসে জাতীয় চেতনার উন্মেষ। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন—ভারত-বিভাগ ও স্বাধীনতা—রাজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক ও তাদের দায়িত্ব :

(ক) পরিবার-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মূল্য—ভারত-সংগঠনে কিশোর-তরুণদের দায়িত্ব। পরিবার-জীবনে নাগরিক চেতনার উন্মেষ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবারের প্রভাব—পরিবার-জীবনের বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন। গৃহ-সমস্যা—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি।

(খ) শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ—বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক চেতনার উন্মেষ—বিদ্যালয় ও সমাজ—বৃত্তি-নিরূপণ।

(গ) স্থানীয় সরকার ও শাসন-ব্যবস্থা। শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকদের সহযোগিতা। কর-নিয়ন্ত্রণ ও নির্ব্বাচন। স্থানীয়, জেলা ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ।

(ঘ) জাতীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা—জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যকলাপ। বিচার-বিভাগের ক্রিয়া ও প্রভাব।

(ঙ) ভারতের জনসংখ্যা—খাদ্য-সংস্থান ও খাদ্য-বণ্টন। কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কার-পদ্ধতি—সেচ ও বিবিধার্থসাধক পরিকল্পনা। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন—ভূদান-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন। ঋণ সালিসী বোর্ড—সমবায় প্রথায় কৃষি-ব্যবস্থা।

(চ) জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন।

বস্ত্রশিল্প—আমাদের খনিজ সম্পদ—ভারী শিল্পের উন্নতি—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আঞ্চলিকতা—ছোটখাট কুটীর-শিল্প—শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সামাজিক উন্নয়ন।

(ছ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

বিশ্ব সমাজ-গোষ্ঠী ঃ

(ক) যানবাহনের ক্রমোন্নতি—বাণিজ্যিক যোগসূত্র—আজকের পৃথিবী।

(খ) বিশ্ব-যুদ্ধ ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা—লীগ অব নেশন—ইউ. এন. ও. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান। পঞ্চশীল—মানুষের কাজে আণবিক শক্তির প্রয়োগ।

স্থানীয় সমাজ-জীবন (নমুনা)

বিচিত্র এই পৃথিবী। তাই এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাও বৈচিত্র্যময়। এদের সমাজ-জীবনও বিচিত্র। কোনও সমাজ উন্নত, আবার কোন সমাজ হয়ত অনুন্নত। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জনসমাজ প্রায় দু'শ বছরের প্রচেষ্টায় শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী হ'য়ে সুখী ও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু জনসমষ্টিকে এখনও পর্য্যন্ত বর্ব্বর আখ্যা দিতে পারা যায়। তাই স্বভাবতঃই এই প্রশ্নটা আমাদের মনে আসে—সমাজ-জীবনে এই বৈচিত্র্য আসে কি প্রকারে? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজ-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতির প্রভাব মানুষের জীবনে বেশ কিছু পরিবর্ত্তন এনে দেয়। কোথাও শীত ঋতুর প্রচণ্ড প্রকোপ, কোথাও নিদাঘের প্রখর উত্তাপ, কোথাও বর্ষাবিধৌত শ্যামলিমা, আবার কোথাও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঔজ্জ্বল্য। জলবায়ু হিসাবে জীবনযাত্রা অনুরূপ হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-জীবন গ'ড়ে ওঠে। সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়ে

আলোচনা ক'রলে বলা যায় যে, সমাজ-জীবন-গঠনের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে প্রবল ও বৈচিত্র্যময়। যাই হোক, আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী তখন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবন কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত এবং কিভাবে এ-কে আরও সুসংহত করা যায়, আমাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ভৌগোলিক বিবরণ—ভৌগোলিক পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী জনসমষ্টির জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ রূপ ধারণ করে। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা জানতে গেলে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের আবশ্যক।

আয়তন ও সীমা—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশকে পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। র‍্যাডক্লিফ-সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাতা, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর জেলার ২টি থানা, নদীয়া জেলার ১৩টি থানা, রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা, ৫টি থানা বাদে জলপাইগুড়ি জেলা, মালদহ ও দিনাজপুর জেলার যথাক্রমে ১০টি ক'রে থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঠন। কোচবিহার জেলা ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনভুক্ত ছিল। আজ এটি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর থেকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পুরুলিয়া ও কিষাণগঞ্জ মহকুমার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন হ'য়েছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ। বর্ত্তমানে এর আয়তন ৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার।

এই রাজ্যের উত্তরে গগনচুম্বী হিমগিরি, দক্ষিণে পরিব্যাপ্ত বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান।

প্রাকৃতিক বিভাগ—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল। রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগসূত্র কম। দার্জ্জিলিং জেলার খানিকটা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার—এই কয়েকটি ভূখণ্ড পার্ব্বত্য অঞ্চলের আয়তন নির্দ্দেশ ক'রছে।

এর উত্তরে সিকিম ও ভুটান রাজ্য। সমগ্র পার্ব্বত্য অঞ্চল আয়তনে মোট পাঁচ হাজার বর্গমাইল। পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিম্নে তরাই অঞ্চল। শিলিগুড়ি মহকুমা ও কার্শিয়াঙের পূর্ব্বাংশের সঙ্কীর্ণ অঞ্চলকে তরাই অঞ্চল বলে। কালিম্পঙ ও ভুটানের দক্ষিণে তিস্তা ও সঙ্কোশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের নাম ডুয়ার্স। অরণ্য, নদী, ছোট ছোট পাহাড়, সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, উর্ব্বর সমভূমি এই অঞ্চলকে বিশিষ্টতা দান ক'রেছে। উত্তরাংশের বিখ্যাত চা-বাগানগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

এছাড়া বাকী অংশ পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি। এই সমভূমিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সম্প্রতি বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, গোপালপুর, মুডা, ইসলামপুর ও কিষাণগঞ্জের কিছু অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত হওয়ায় এই অঞ্চলের আয়তন বর্দ্ধিত হ'য়েছে। এর আয়তন ৩,৫৫২ বর্গমাইল। বাংলায় সমতল অপেক্ষা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চলের সাদৃশ্য বেশী থাকায় এই অঞ্চলের জমিতে কাঁকরের ভাগ বেশী এবং অন্যান্য সমভূমি থেকে উঁচু। সমভূমির দ্বিতীয় অংশ গঙ্গা, ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত এবং গঙ্গানদীর ব-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী। ২৪-পরগণা, কলিকাতা, নদীয়ার প্রায় সমস্ত অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অর্দ্ধাংশ নিয়ে এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে উপকূলভাগের সমভূমি। ২৪-পরগণার ভূমির উচ্চতা কম এবং এর দক্ষিণে যে অসংখ্য খাড়ি আছে সে স্থান দিয়ে সমুদ্রের জোয়ারের জল জেলার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দক্ষিণাংশকে সিগ্ধতা দান ক'রেছে। ২৪-পরগণা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা হ'লেও এর এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অংশের তৃতীয় ভাগ বর্দ্ধমান বিভাগ। পূর্ব্বে এই অঞ্চলের কিয়দংশ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে ও উত্তরে সাঁওতাল পরগণা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর। এই অঞ্চলের পূর্ব্বাংশ ভাগীরথীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী। পশ্চিম ভাগে ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল রুক্ষ ও শুষ্ক। দক্ষিণাংশের কাঁথি মহকুমার রামনগর ও কাঁথির দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-বিধৌত। বর্দ্ধমান বিভাগের ৬টি জেলা, মুর্শিদাবাদের পশ্চিম ভাগ এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

নদ-নদী—বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ ব'লেই আমরা জানি। পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টিবহুল ও মৌসুমী বায়ুর অঞ্চল ; তাই এখানে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির অধিকাংশই এই বৃষ্টির জল বহন করে। হিমালয় ও ছোট-নাগপুরের পাহাড় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির উৎপত্তি এবং দু'একটি ছাড়া সবগুলিই দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবহমান। গঙ্গানদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হ'য়ে উত্তর ভারতের সমতলভূমির ভেতর দিয়ে রাজমহল পাহাড়ের কাছ থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরেছে, পরে মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমা দিয়ে ব'য়ে এসেছে। রাজমহলের কাছাকাছি এসে ভগবানগোলার কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়েছে। ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকটে গঙ্গার শাখানদীরূপে প্রবাহিত হ'চ্ছে। পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী হ'য়েই গঙ্গা সমুদ্রে মিশত। ক্রমে ভাগীরথী পলিতে ভরাট হ'তে আরম্ভ ক'রলে গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বইতে থাকে। গঙ্গা বা পদ্মা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে জলঙ্গী, ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্যে প্রবাহিত। কৃষ্ণনগরের কাছে পশ্চিমমুখী হ'য়ে জলঙ্গী ভাগীরথীতে প'ড়েছে। কলিকাতা ও ২৪-পরগণার পাশ দিয়ে ভাগীরথীর যে অংশ সমুদ্রে গিযে মিশেছে তারই নাম হুগলী নদী। পশ্চিমবঙ্গের সুখ ও সমৃদ্ধিতে হুগলী নদীর দান অপর্য্যাপ্ত। বহির্বাণিজ্যের পণ্য চলাচল একমাত্র হুগলী নদীর ওপর দিয়েই হ'য়ে থাকে। এই নদীর দুই তীরে প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি অবস্থিত।

ছোটনাগপুরের দু'হাজার ফুট উঁচু পালামৌ পাহাড় থেকে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ দামোদর নদ বর্দ্ধমান, হাওড়া ও হুগলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে হুগলী নদীতে মিশেছে। বরাকরকে নিয়ে দামোদরের উপনদী মোট নয়টি—আবার বরাকরের উপনদী ৫টি। এই চৌদ্দটি নদীর সম্মিলিত বিপুল জলরাশি দামোদরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। বর্ষায় তাই দামোদর ভীষণ রূপ ধারণ ক'রে চীনের হোয়াংহোর মত 'দুঃখ নদী'তে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে দামোদরকে সুসংযত ক'রবার অভিপ্রায়ে দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার কাজ প্রায় পরিসমাপ্তির পথে।

অজয়, কাঁসাই, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীগুলিও ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে উৎপন্ন। রূপনারায়ণ ও কাঁসাই ভাগীরথী নদীতে প'ড়েছে। সুবর্ণরেখা মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ ক'রে বঙ্গোপসাগরে প'ড়েছে।

তিস্তা নদীর উৎপত্তি-স্থল সিকিমের এক হিমপ্রবাহ থেকে। গ্রীষ্মকালে সিকিমের তুষার গ'লে যাবার সময় তিস্তার জল বৃদ্ধি হ'তে সুরু করে এবং বর্ষায় দামোদরের মত স্ফীত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক অঞ্চল গ্রাস ক'রতে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। তিস্তা নদী উত্তর-পশ্চিম কোণে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশের পরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলার ওপর দিয়ে কোচ-বিহারের ছিটমহলের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার ভেতর দিয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। মহানদী বা মহানন্দা দার্জ্জিলিং পাহাড় থেকে উৎপন্ন হ'য়ে পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে মালদহের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশ ক'রেছে।

জলহাওয়া—জলবায়ুর তারতম্য সূচিত হয় কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপের বিভিন্নতার জন্যে। কর্কটক্রান্তিরেখা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় র'য়েছে। তাছাড়া কাছাকাছি সমুদ্র থাকায় এবং প্রচুর বারিপাতের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলহাওয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় উষ্ণ ও আর্দ্র। আসানসোল অঞ্চল উষ্ণমণ্ডল এবং দার্জ্জিলিং অঞ্চল শীতমণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালের শুষ্ক বায়ুতেও জলীয় বাষ্পের অংশ থাকে। উত্তরে দার্জ্জিলিং অঞ্চলে শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম মোটামুটি। বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুব প্রচলন থাকলেও গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি ঋতুরই স্থায়িত্বটা অনুভব করা যায়। ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল, আষাঢের প্রথম থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি বর্ষাকাল, আর আশ্বিনের শেষ থেকে ফাল্গুনের প্রথম পর্য্যন্ত শীতকাল। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুব প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালেও বৃষ্টি হয়। সমভূমিতে বর্ষাকালে ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। কলিকাতায় বছরে গড়ে ৬২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১০ ইঞ্চি—পশ্চিমবঙ্গে এখানেই সর্ব্বোচ্চ বারিপাত হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ—পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই। জলবায়ু প্রায় ক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন হওয়ায় খনিজ, কৃষিজ ও বনজ প্রায় সব কয়টিই কিছু-না-কিছু পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। কারণ প্রকৃতি থেকেই মানুষ আহার্য্য, পরিধেয় আহরণ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক

শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রকাশ

শিক্ষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আজ অনেক নতুন চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন আজ অনুভূত হ'য়েছে। তাই গতানুগতিক শিক্ষারীতির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের প্রচেষ্টা। যাতে আনন্দ ও স্ফূর্তির সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ না ঘটে, সেজন্যে শিক্ষকের দৃষ্টি আজ সহানুভূতিপূর্ণ। সহানুভূতি ও সমবেদনা শিক্ষাকে সহজ ক'রে তোলে—শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমিয়ে আনে।

স্বাধীনতা ব'লতে এখানে স্বেচ্ছাচার বোঝায় না—বোঝায় প্রাণের সহজ স্ফূর্তি। যে যার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে, এই হ'চ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনতার মূলকথা। যাঁরা এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাঁদের মতে —স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হ'লে বিকাশ হবে ব্যাহত, শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ বিশ্বাসের পিছনে অনেক মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে। ফ্রয়েবল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলাফল প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। তাঁদের সব গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আলোকের সন্ধান দিয়েছে। তাই শিশুর চলচপল চিত্তকে শাসন-শৃঙ্খলার চাপে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া তাঁদের মতে অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুদের প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ ক'রে না দিয়ে তাকে নানা খাতে বইয়ে দেওয়াই হ'ল বাঞ্ছনীয়।

নানা ভাবে শিক্ষার্থীকে আত্ম-প্রকাশের পথে সহায়তা ক'রতে হবে, তাই সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা ক'রবার প্রয়োজন।

বিদ্যালয়-জীবনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাকে আনন্দের বস্তু ক'রে তুলতে পারলে, তবেই সুফল ফ'লবে।

চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করাই হবে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই আত্ম-প্রকাশের সুযোগ নানা ভাবে দেওয়া যায়।

পত্রিকার রচনা ও প্রকাশ, চারুশিল্পের প্রদর্শনী, বিতর্কসভার আয়োজন, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, অভিনয়, পত্রিকা-সম্পাদনা ও নানারূপ সংগঠনমূলক কার্য্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আজকের শিক্ষার যা-কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে রসের কার্পণ্য দেখা দিয়েছে। ফলে শিক্ষা আনন্দময় না হ'য়ে—হ'য়ে ওঠে গতানুগতিক ও প্রাণহীন। তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীর মতে শিক্ষার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ পরিবেশন করা উচিত। কারণ মানুষের মাঝে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির প্রেরণা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও ক্রিয়া বা কোনরূপ কার্য্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক,—ছন্দোময়। বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই।

আর প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে দেখা দেওয়া উচিত সহযোগিতা। সহপাঠীদের মধ্যে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ও হৃদ্যতাই শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলবে। তবেই হবে মানব-প্রীতির উদ্বোধন—তবেই জাগবে বিশ্ব-প্রীতির মহান্ আদর্শ।

বিদ্যালয়-জীবনের সামাজিক দিক

বিদ্যালয়ের শ্রেণীর বাইরে নানারূপ কার্য্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক চেতনার উন্মেষ সাধন করা একান্ত কাম্য। শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যাতে সমাজকে ও দেশকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে নানা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ক'রতে হবে। যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলবার জন্যে এই আয়োজন। এই বিরাট দায়িত্বের অংশ বিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত। পল্লী-উন্নয়নের কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করা, জনসেবার আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করা ও "স্কাউটিং" বা একসাথে কোথাও গিয়ে তাঁবুতে বাস করা বা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা করা প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের কাজ কেবল শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। কিভাবে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর। কারণ নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর মনকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

খেলা :—সুস্থ বালকদের খেলা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। খেলাতে তারা আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশী। তাই খেলতে তারা ভালবাসে। খেলায় দৌড়, লাফ, প্রভৃতি প্রধান দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাদের শরীর সুগঠিত হয় ও তারা শক্তিমান হয়। খেলার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় এবং নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। কাজেই খেলা সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সততা, সংযম, নিশ্চয়তা, ক্ষিপ্রতা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্র-গঠনের আবশ্যিক গুণগুলি খেলাতে দরকার হয়। খেলার ভিতর দিয়ে এ-সব অভ্যাসে পরিণত হয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার ক'রলে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে খেলার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

খেলাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি বড়রকমের খেলা। আর যে-সব খেলাতে কম জায়গার দরকার, নিয়মাবলী অতি সরল বা উপকরণও খুব সংক্ষিপ্ত, সেই সব খেলাকে ছোট খেলা বলা যেতে পারে। খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে ছেলেদের কাছে তার মূল্য বেশী। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাতে ছেলেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ ক'রতে শিখে। তারা বুঝতে পারে যে, দলকে বিজয়ী ক'রতে হ'লে একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। খেলার মাধ্যমে তারা শেখে সহযোগিতা। আত্মপ্রাধান্য দেখাবার চেষ্টা না ক'রে, দলের জন্যে প্রত্যেকে তার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ক'রতে অভ্যস্ত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্যে আন্তঃস্কুল খেলা উল্লেখযোগ্য।

প্রতিযোগিতার মধ্যেই যদি স্কুলের খেলার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে, তা হ'লে অন্য সব ছেলেদের বঞ্চিত করা হয়। যাতে বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্র খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, কার্য্য-তালিকা সেরূপ হওয়া উচিত। সকল ছেলের মঙ্গল-বিধানই বিদ্যালয়ের কাম্য। প্রতিযোগিতার ভাব বজায় রেখে বিদ্যালয়ের খেলার ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এরূপভাবে ভাগ ক'রতে হয় যাতে একই বয়স ও শক্তির ছেলেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এর প্রকৃষ্ট উপায় হ'চ্ছে বিদ্যালয়কে প্রথমতঃ ৪টি 'হাউস'এ বিভক্ত করা। বয়স, উচ্চতা, ওজন বিবেচনা ক'রে প্রত্যেক হাউস 'সিনিয়র', 'ইন্টারমিডিয়েট' ও 'জুনিয়ার'

এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হবে। এতে প্রত্যেক 'হাউসের' প্রত্যেক শাখা পরস্পর বয়সানুযায়ী খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারবে। প্রত্যেক 'হাউস'ই একজন শিক্ষকের অধীনে থাকবে। তিনি হবেন 'হাউস মাষ্টার'। খেলা যাতে সুপরিচালিত হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাতে যাতে ছেলেদের মধ্যে রেষারেষি, প্রতিহিংসার ভাব না জাগে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। হাউসগুলো আমাদের দেশের মনীষীদের নাম অনুযায়ী হ'লে ভাল হয়। ঋতু অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হাডুডু, হিন্দুস্থান বল, হকি প্রভৃতি খেলাতে আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতা হবে। বড় (সিনিয়াররা) বড়দের সঙ্গে, মাঝারী (ইণ্টারমিডিয়েট) এবং ছোট (জুনিয়ার) যথাক্রমে মাঝারী এবং ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রবে। প্রত্যেক খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ হবে। বৎসরান্তে অধিকসংখ্যক 'পয়েণ্ট' অর্জ্জনকারী 'হাউস'কে চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা ক'রতে হবে।

মজলিস, মেলা, এক্সকারশন :—ছেলেদের অনেকের ভেতরই কোনও না কোন বিষয়ে বেশ শক্তি-সামর্থ্য থাকে। তাদের সেই সব সামর্থ্য-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। মজলিসে তারা সেই সব সুযোগ পায়। কাজেই বিদ্যালয়ের কার্য্য-তালিকায় ক্যাম্পিংএর স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত। ক্যাম্প বা মজলিস হবে উম্মুক্ত স্থানে এবং দু'একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চালিত হবে। এখানে ছেলেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গান, আবৃত্তি, অভিনয়, কৌতুকাভিনয় বা কৌতুকপ্রদ খেলা ক'রবে। ছেলেরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এতে অংশ গ্রহণ ক'রবে। এতেও কাজের মান অনুযায়ী পয়েণ্ট দেবার ব্যবস্থা থাকবে। কোন 'হাউস' কি দেখাবে বা কি ব'লবে তার একটি তালিকা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে দেবে। শিক্ষক মহাশয় তা থেকে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয় অনুমোদন ক'রবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সব ছেলে মাঠে হাউস হিসাবে অর্দ্ধ-গোলাকৃতি হ'য়ে বসবে। শিক্ষক মহাশয় পূর্ব্ব-তালিকা-অনুযায়ী এক এক হাউসকে পর পর তাদের অংশ গ্রহণ ক'রতে আহ্বান ক'রবেন। এতে ছেলেরা শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রবার সুযোগ পায় ও প্রচুর আনন্দ ভোগ করে। যাতে একঘেঁয়ে বা ক্লান্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে

শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে এদের দিয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান করাবেন বা কিছু খেলা দেবেন।

বছরে একবার স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা দরকার। এই সপ্তাহে থাকবে প্রদর্শনী বা মেলা। তাতে পোষ্টার, মডেল দ্বারা নানা বিষয় দেখানো যাবে। সোজা দাঁড়ানো, বা বসার যে দরকার, ব'সবার বা দাঁড়াবার দোষে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী হয়, তার ছবি কিংবা মডেলের সার্থকতা আছে। উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ছবি ও মডেলের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। এবিষয়ে কিছু ফিল্মও দেখানো দরকার। বিশেষজ্ঞদের এক এক বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখবে। ছাত্রদের উপর নানা বিভাগের কাজের ভার থাকবে। কর্ম্মকর্ত্তাও তাদের থেকে নির্ব্বাচিত হবে। প্রতি বিষয়ে একজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন।

প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি হাউসে স্বাস্থ্য-ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বীকার্য্য ছেলেরাই এই ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হবে। উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন 'হাউস মাষ্টার' বা 'ক্লাস মাষ্টার'। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির সাথে যোগাযোগের দ্বারা এসম্বন্ধে কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

গ্রামের লোকেরা কিরূপ পরিবেশে বাস করে, সেগুলো স্বচক্ষে দেখা ও তার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, চিকিৎসা-কেন্দ্র, জল-সরবরাহ-স্থান, গ্রামের কূপ, বাজার প্রভৃতি স্থান দেখলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। কোন্ অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তারও একটা ধারণা জন্মে। শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের এ-সব স্থান দেখাবার ব্যবস্থা ক'রবেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কিরূপ কাজ ক'রছে সে অভিজ্ঞতার জন্যে রেড ক্রস সোসাইটি, গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ, কর্পোরেশন স্বাস্থ্য-বিভাগ প্রভৃতি পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য।

আনন্দ-উৎসব :—বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন

করা বাঞ্ছনীয়। বিচিত্রানুষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা-সমিতি ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্তশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। নানাভাবে আত্ম-প্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে দিতে পারলে, তবেই তাদের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। বিদ্যালয়-জীবনের অবসর মুহূর্ত্তকে ভরিয়ে তুলতে হ'লে, তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হ'লে চাই এই সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন। নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একাধারে শিক্ষামূলক ও আনন্দময়। যে যার রুচি অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ ক'রতে পারে। এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও এই সব প্রদর্শনী গ'ড়ে উঠতে পারে। ডাক-টিকিট-সংগ্রহ ও নানারূপ নমুনা আহরণ ক'রতে শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়।

বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা

বিদ্যালয় ব'লতে যা বোঝায় তার সব-কিছুই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে। তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই শিক্ষকের নিত্যনূতন আয়োজন। তাই ইট, কাঠ, যন্ত্রপাতির সমারোহকে বাদ দিয়েও প্রাচীন ভারত বাণী-তীর্থের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। সেখানে ঘ'টেছিল মনীষার স্ফুরণ, প্রতিভার অভ্যুদয়।

আজ বিদ্যালয়ের যে রূপ আমরা দেখি, তার মধ্যে একাধিক শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়াও অনেক কিছু আয়োজনের বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু এমন অনেক বিদ্যা-নিকেতন গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে একজন শিক্ষকের চেষ্টা ও সাধনাই ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ফলে অনেক বিদ্যালয়েই মাত্র একজন শিক্ষক শিক্ষার আয়োজন ক'রতেন, আর তাকে ঘিরেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-লোকের সন্ধান মিলত। কিন্তু যিনি এই গুরু দায়িত্ব নিতেন তাঁর ওপর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রত। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে একজন শিক্ষকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'ত একথা চিন্তা ক'রলে আজকের দিনে বিস্ময় জাগে। দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও এই একজন গুরুকে কেন্দ্র ক'রেই বহু শিক্ষার্থীর বিদ্যালাভ হ'ত।

আদর্শের কথা বাদ দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে বহু সমস্যা দেখা যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর মানসিক মান ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক সেখানে এই শ্রেণী-বিভাগ কি ক'রে সম্ভব হয়, এই প্রশ্নই বারংবার মনে জাগে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা অটুট রাখা একজন শিক্ষকের পক্ষে অসুবিধাজনক। তাছাড়া বিদ্যালয়কে গ'ড়ে তুলতে হ'লে সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাদান-কার্য্য ছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও অনেক দায়িত্ব আছে। খেলাধুলার ব্যবস্থা ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয়-জীবন নীরস হ'য়ে পড়ে। আর এই সব অনুষ্ঠান আয়োজন ক'রতে হ'লে একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। তা হ'লেই প্রশ্ন ওঠে যে একজন শিক্ষকের পক্ষে কোন বিদ্যালয়-পরিচালনা তবে কি মোটেই সম্ভব নয়? কিন্তু দেখা যায় যে, এককালে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু একথাও বলা যায় না যে, সে-সব বিদ্যালয়ে কোন কিছুই সার্থক হ'ত না।

বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে যে, যে-সব শিক্ষক এই সব গুরুভার নিতেন নানা উপায়ে তাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রতেন। আজকের দিনে ছাত্রদের মধ্যে এই যে স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনা প্রচলিত হ'য়েছে তা সেদিনও ছিল। কারণ ছাত্রদের সহযোগিতায় এই সব বিদ্যালয়-পরিচালনার সম্ভব হ'ত। বিভিন্নভাবে শিক্ষক এই সহযোগিতা কার্য্যকরী ক'রে তুলতেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে কয়েকটি শিক্ষার্থীর ওপর শ্রেণী-পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ত এবং তারাই শ্রেণী-পরিচালনার ভার নিত। কেবল তাই নয়; শ্রেণীর পাঠনও এই সব ভাল ছেলেদের দিয়ে সম্ভবপর হ'ত। অনেক সময় শ্রেণীর মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ বা যাদের মধ্যে কিছু নেতৃত্বসুলভ গুণ দেখা দিত, তাদের সহযোগিতায় রক্ষা হ'ত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা। কিন্তু এই পদ্ধতির যেমন সুবিধা তেমন অসুবিধাও আছে।

সুবিধা ঃ—অনেক সময় এই পদ্ধতির ফলে ছাত্রদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় ও নেতৃত্বের উন্মেষ হয়।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ একাধিক শিক্ষকের বেতন দেবার সমস্তা এখানে নেই।

শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবকাশ এই সব বিত্যালয়ে প্রচুর।

অসুবিধা ঃ—শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকটি ছাত্রকে প্রাধান্ত দেবার ফলে অনেক সময় নানারূপ সমস্তা দেখা দেয়। শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রনেতা প্রধান শিক্ষকের আজ্ঞাবাহী হ'য়ে পড়ে, না হয় অনেক সময় তাদের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা কমে আসে ও অন্যান্য ছাত্ররাও এই কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের দলভুক্ত ব'লে মনে করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে যত সুবিধাই হোক না কেন, যে বিত্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক সেখানে শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন হ'য়ে পড়ে। কারণ একজন শিক্ষকের পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা শিক্ষার্থিগণ সারাদিন একই শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, ফলে তারা নিত্যনূতন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায় না।

আবার অনেক সময় শ্রেণীর নেতারা দলে প'ড়ে নানা অপ্রত্যাশিত আচরণ ক'রতে থাকে।

আজ শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে পাঠচক্র সংগঠন ক'রবার কথা খুব শুনতে পাওয়া যায়। কারণ এর ফলে পারস্পারিক আলোচনা ও পরস্পরের মনোভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হ'তে পারে। জ্ঞানের দৈন্য পরস্পরের সহযোগিতায় দূরে যায় ও সকলের প্রচেষ্টায় যে-কোন সমস্তার সমাধান সম্ভব হয়। তাছাড়াও এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া যায়। কেবল তাই নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে সক্রিয়তাকে জাগিয়ে দিলে শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এই সব পরিকল্পনাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, যেমন কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, কোন স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা (Excursion) বা অনুরূপ কোন

শিক্ষামূলক আয়োজন করা ইত্যাদি। মোট কথা, এই সব পরিকল্পনা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থিগণকে রুচি অনুযায়ী ভাগ ক'রে দিয়ে এক-একটি ক্রিয়ার ভার তাদের ওপর ন্যস্ত ক'রলে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে শিখতে পারে, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে।

বিত্থালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা:—কি জাতীয় জীবন, কি বিত্থালয়-জীবন, প্রত্যেকটি জায়গায় শৃঙ্খলাবোধ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার ক'রতেই হবে। এই শৃঙ্খলাবোধের যে প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তা আলোচনার বিষয়-বস্তু।

পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচ-বোধকেই শৃঙ্খলার প্রধান লক্ষণ ব'লেই মনে করা হ'ত। তাই শিক্ষকগণের মধ্যে এই প্রকার ধারণার জন্যে শিক্ষার স্বাধীন গতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চারই ছিল শৃঙ্খলা-রক্ষার একমাত্র উপায়। শাসন-ব্যবস্থা থেকে শৃঙ্খলা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমন ধারণার পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না। একমাত্র তর্জ্জনের দ্বারা শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করাই নাকি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাই হয় তবে শৃঙ্খলা ও শাসন এই দু'য়ের প্রকৃত অর্থের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপ, তাও ভেবে দেখা দরকার।

পূর্ব্বে শৃঙ্খলা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, ক্রমশঃ তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদ লোকচক্ষেও ঘৃণার বস্তু হ'য়ে উঠল। ফলে আদর্শবাদের প্রভাব দেখা দিল। একমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চারিত্রিক আকর্ষণের দ্বারাই যে বিত্থালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা অটুট থাকতে পারে, একথাই তখন মেনে নেওয়া হ'ল। ফলে শাসনদণ্ডের পরিবর্ত্তে শিক্ষকদের আত্ম-বিস্তারের প্রয়াস দেখা দিতে থাকল। শিক্ষার্থীরা শাসন-শৃঙ্খলাবোধের নামে নির্য্যাতনের হাত থেকে পেল মুক্তি এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। শিক্ষার্থীদের ভাবপ্রবণ মনে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগানোই যে সব থেকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একথাই স্বীকার করা হ'ল। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা ক'রে কিছুকালের মধ্যে সুরু হ'ল এই ব্যক্তিত্ববাদের ভাঙ্গন। এই ব্যক্তিত্ববাদ যে ভবিষ্যতে সফলতা লাভ ক'রবে একথা মেনে নেওয়া হ'ল না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আবার এক নতুন পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট হ'ল।

ক্রমশঃ সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদের অবসান হ'লে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শাসন-শৃঙ্খলার পরিকল্পনা করা হ'ল। ইংরাজীতে একে বলে "Emancipation" বা স্ফূর্ত্তিবাদ। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের, বিশেষ ক'রে শিশুদের, মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কোন প্রকারে সঙ্কুচিত করা উচিত নয়। অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই স্বতঃস্ফূর্ত্ত শৃঙ্খলা-বোধ জাগ্রত হবে, এই হ'ল এই মতবাদের গোড়ার কথা।

কিন্তু এর অপর দিকও চিন্তা করা উচিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্ফূর্ত্তি ও প্রবণতার জন্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে মতবাদ অনুযায়ী অভিজ্ঞতা ও স্ফূর্ত্তিবাদ গ'ড়ে উঠেছে—তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুঃখের কারণরূপে দেখা দিয়েছে। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কাজ ক'রতে গিয়ে চঞ্চল শিক্ষার্থিগণের সমস্যার সম্মুখীন হওযার সম্ভাবনাই বেশী। যদি একমাত্র নবলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই সত্যানুভূতির সঞ্চার হয়, তবে অতীত অভিজ্ঞতা কিংবা মনীষিগণের বিধান সম্পূর্ণ নিরর্থক ব'লে প্রতিপন্ন হয়।

তাই ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ফূর্ত্তিবাদ এই দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধানই সব থেকে কার্য্যকরী নীতি। শিক্ষার্থীদেব আত্ম-প্রকাশকে ক্ষুণ্ন না ক'রে বিভিন্ন প্রণালীতে তার পরিচালনা করার ব্যবস্থা ক'রলে বিদ্যালযে শৃঙ্খলা বজায থাকে এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে।

একটু লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যায় যে, জীব-জগৎ ও জড়-জগৎকে কেন্দ্র ক'রেই বিভিন্ন বিষযের উদ্ভব হ'যেছে, তাই এদের মধ্যে সম্পর্কও নিবিড়।

সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত ক'রতে হবে যাতে শিক্ষার্থি-চিত্তে আনন্দের সন্ধান মিলবে। ফলে শাসনের প্রয়োজনও কমে আসবে।

তাই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শৃঙ্খলা-বোধকে যে জাগানো যায় তা আজ স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে। ইংরাজীতে একে বলে Free Dicipline.

শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ করা যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি শিক্ষার্থি মনে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কি উপায়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে :— শৃঙ্খলা-বোধকে জাগ্রত ক'রতে হ'লে প্রথমে বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ ক'রতে

হবে। আজ সমাজ-সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নীতি ও আদর্শের প্রভাব যেন ক্রমশঃ কমে আসছে। ফলে বৃহত্তর সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা শিক্ষার্থি-চিত্তের স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্যবোধকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থি-সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হ'ল শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের অভাব। বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষক-সমাজ অন্ন-সংস্থানের জন্যে এতই উদ্ব্যস্ত যে, তাঁদের অনেককে দ্বারে দ্বারে উপশিক্ষকতার জন্যে ফিরতে হয় ও অন্যান্য অনেক অসম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীর ওপর তাঁদের প্রভাব যায় কমে। তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত নির্দ্দেশের অভাবে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রবল হয়। নানা অবাঞ্ছনীয়ভাবে তাদের প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে। পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি অনুরাগের অভাব ও ঔদাসীন্য এই বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ।

এই পাঠ্য-বস্তুর প্রতি অনুরাগের অভাবের জন্যে দায়ী কে? শিক্ষক, শিক্ষার্থী না পরিবেশ? দায়ী যেই হোক না কেন পাঠ্য-বস্তুকে যদি শিক্ষক আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেন তবে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হ'তে পারে। এর জন্যে শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল চপল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তির প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট অবকাশের সৃষ্টি করা। কারণ প্রাণশক্তির অপপ্রয়োগের ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এইজন্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। তাদের হাতেই তাদের শাসন-শৃঙ্খলার ভার আংশিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এইজন্যে প্রত্যেক শ্রেণীতে শ্রেণীতে ছাত্র-নেতা ও তার অধীনে একটি ক'রে ছোটখাট সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া নানা সৃজনাত্মক কাজে তাদের নিয়োজিত ক'রতে পারলে এই প্রবল সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

কিন্তু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যতদিন একটা নিবিড়, মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে না উঠবে ততদিন পূর্ণ শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কম।

মোট কথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সবল মন যাতে শৈশব থেকে গ'ড়ে উঠতে

পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তা ক'রতে হ'লে চাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক, অনুকূল পরিবেশ ও আত্ম-প্রকাশের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা।

শাসনের অন্য দিক—শাসন ও অনুশাসনের সার্থকতা আছে যদি তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। অনেক সময় শাসন, শৃঙ্খলার পরিপোষক না হ'য়ে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির উদ্দেশ্য হয় গৌণ।

মনের ওপর রেখাপাত ক'রে অপরাধ থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করাই হ'ল শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তা ভুলে গিয়ে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি নিয়ে যদি দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়, তবে শাসনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। এতে বিপরীত ফল ফলতে পারে।

অপরাধের প্রবৃত্তিকে দমন করাই হয় শাসনের অন্যতম লক্ষ্য। কোন সময় বা অপরাধীর সংশোধন শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আবার কখনও বা শাস্তির উদ্দেশ্য হবে উদাহরণ সৃষ্টি করা। কিন্তু শাস্তির উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, যতক্ষণ তা অপরাধীর চিত্তকে স্পর্শ না ক'রছে ততক্ষণ তা কার্য্যকরী হ'তে পারে না। এইজন্যে বহু রকমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কখনও অপমান, তিরস্কার, কখনও শ্রেণীতে ছুটির পর আটকে রাখা, কখনও জরিমানা, কখনও বা দৈহিক শাস্তি।

শাস্তি মনস্তাত্ত্বিক না হ'লে অপরাধীর মনে শাসকের বিরুদ্ধে আরও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে অপরাধ-প্রবণতাও যায় বেড়ে।

আবার অতিমাত্রায় দমন ক'রতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। দমনের ফলে নানা বিকৃতি ও বৈক্লব্য দেখা যেতে পারে। তাই সে সম্পর্কেও সচেতন হ'তে হবে।

তাই কেবল শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা-রক্ষা সম্ভবপর নয়। যে যার রুচি ও অনুরাগ অনুযায়ী যদি কাজ ক'রতে পায়, যদি প্রত্যেকের শক্তি ও উৎসাহ ঠিক-ভাবে প্রকাশের পথ পায়, তবে দেখা যাবে যে অপরাধ-প্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অভিভাবক ও শিক্ষকের যথাযথ নির্দেশ ও সহানুভূতির অভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে হতাশা ও পরে নানা বিকৃতি দেখা

দেয়। তাই বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে যে, মানসিক বিকৃতির জন্যে বেশী দায়ী শিক্ষার্থীর পরিবেশ।

বিদ্যালয়-জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্থান

বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। মানুষকে এই প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে তাকে অনেক সংগ্রাম ক'রতে হয়। বাস্তবের এই চিত্র কঠোর হ'লেও সত্য, তাই শৈশব থেকেই ভাবী জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্দেহ জাগলেও তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যে যার নিজস্ব যোগ্যতা ও মূল্য অনুযায়ী সমাজে আসন ক'রে নেয়। তাই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হ'য়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এক রকম অসম্ভব।

বিদ্যালয়-জীবনেও এই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঁকি দেয়। সেখানেও ভাল, মন্দ, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমানের পৃথক মর্য্যাদা দেওয়া হয। তা ছাড়া বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি এই প্রতিযোগিতাকে পরিপুষ্ট ক'রেছে, কিন্তু সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া ও সমানভাবে দেখা গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা। কিন্তু তবুও মানুষে মানুষে পার্থক্য না দেখা দিযে পারে না। আর এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি ক'রে কেবল বিদ্যালয়ে কেন, সব ক্ষেত্রেই মানুষের মূল্য যাচাই করা হয়।

আদর্শের দিক থেকে প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার ক'রলে এর মূল্যকে স্বীকার ক'রতেই হবে। কারণ প্রতিযোগিতার মনোভাবই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কর্ম্মঠ ক'রে তোলে। বিদ্যালয়েও একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়া থাকলে তা শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা যোগায়, তাকে অধ্যবসায়ী ক'রে তোলে।

কোন একটি শ্রেণীতেও দেখা যায় যে, কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের উন্নতির জন্যে বিশেষ যত্নবান হয়। প্রতিযোগিতাই কর্ম্মোৎসাহকে উদ্দীপিত করে।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতা যদি তীব্র রূপ ধারণ করে, যদি অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে তা ক্ষতিকর। কারণ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অভাবে হৃদয়ের সম্পদ অনেক সময় নষ্ট হ'তে দেখা যায়। সহপাঠীদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা যদি স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করে, তবে শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। এইজন্যেই গান্ধীজী শিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতাকে ঠাঁই দিতে চাননি। তাঁর স্বপ্ন ছিল কি বিদ্যালয়-জীবনে, কি বৃহত্তর সংসারে সবখানেই একটা সহযোগিতার পরিবেশ গ'ড়ে তোলা। তাঁর মতে শৈশব থেকেই মানুষের এই হানাহানির প্রবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। মানব-প্রীতির লক্ষ্য নিয়ে সহযোগিতাকে প্রতিযোগিতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। গান্ধীজীর সে স্বপ্ন কবে সার্থক হবে বলা যায় না। তবে আজকের জটিল সভ্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাই মনে হয় যে, বোধ হয় তাঁর দূরদর্শী মন একটি চরম ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদ্যালয়ে নানা রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতার এই আদর্শ ক্রমশঃ সঞ্চারিত করা যায়। যত ভাবে তারা সমবেত হ'য়ে এক সাথে মিলে মিশে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এইজন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার সার্থকতা আছে। আর খেলা-ধুলার ও অন্যান্য পাঠ্য বর্হিভূক্ত কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে সহযোগিতার প্রাধান্য দিতে হবে। যে-কোন উৎসব আয়োজন, সভা-সমিতি, খেলা-ধুলা হোক না কেন প্রত্যেকটিকেই এই সহযোগিতার ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলতে হবে। এইজন্যে শিক্ষকের বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন।

কখনও খেলা-ধুলা, কখনও অভিনয়, কখনও কোন উৎসব-আয়োজন, কখনও বিদ্যালয়ের কোন কাজ (উদ্যান রচনা, পাঠ-চক্র রচনা) ইত্যাদি নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতাকে পরিপুষ্ট করা যায়।

পিতামাতা ও সমাজের সহযোগিতা

সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের যোগসূত্র রচনা করে। কেবল তাই নয়, বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি না থাকলে, শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলের আশা কম।

বিদ্যালয় সমাজেরই ছোটখাট সংস্করণ; তাই বৃহত্তর সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত না হ'লে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই থেকে যাবে।

শিক্ষার্থীর কল্যাণ যেমন শিক্ষকেরও কাম্য তেমন অভিভাবকেরও অধিক কাম্য। তাই তাদের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন। নানাভাবে এই যোগাযোগকে নিবিড় ক'রে তোলা যায়।

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন;

(খ) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ

নানা পায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ নিবিড হ'তে পারে। শিক্ষার্থীর বাড়ীতে যদি মাঝে মাঝে যাতাযাত ক'রে শিক্ষক অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন, তবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হ'য়ে ওঠে। আবার শিক্ষার্থীর যে-কোন প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক তাকে বাড়ীতে আসতে বলবেন। এই যাতায়াতের ফলেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মাবে।

(খ) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ

আজকাল অনেকেই দুঃখ করেন যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যে মধুর ভাব ছিল তা ক্রমশঃই কমে আসছে। কারণ বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় যে, সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা এইজন্যে দায়ী। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফেরে তখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে গিযে পড়ে। সেখানে সে অভিভাবকদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞাসূচক আলাপ-আলোচনা শুনতে থাকে। ফলে শিক্ষকের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি ম্লান হ'তে থাকে।

এই সমস্যা দূর ক'রবার জন্যে শিক্ষককে অগ্রণী হ'তে হবে। তাঁকেই বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে হবে

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যালয়ের পরিচালনা

প্রথমতঃ দেখা যাক শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে কি কি প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষককে সজাগ থাকতে হবে। তাই সে কোন্ দিন উপস্থিত, কোন্ দিন নয়, তার একটা সামগ্রিক ছবি পাবার জন্যে একটি ক'রে বাঁধানো খাতার প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক শাখার জন্যে এই তারিখ ও নাম-সম্বলিত খাতাকে বলা হয় Attendance Register। যে দিন যে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত তা এই খাতা থেকেই বোঝা যাবে। কারণ প্রত্যেক মাসে কোন্ কোন্ শিক্ষার্থী মোট কতদিন উপস্থিত, কতদিন অনুপস্থিত, তা দেখবার জন্যে এই খাতার মধ্যে আলাদা ঘর থাকবে।

শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কার্য্য, উন্নতি, রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি জানবার জন্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যে একখানি ক'রে ছক-কাটা বই থাকবে। তার সম্পর্কে সব-কিছু তথ্য দিয়ে একে একে বইখানিকে ভ'রে তুলতে হবে। মোট কথা এই বইখানিই হবে শিক্ষার্থি-জীবনের একটি প্রতিফলক। ইংরাজীতে একে বলে Cumulative Record Card।

আজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ধরণের Card-এর প্রবর্ত্তন আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। কারণ তা না হ'লে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ, সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভবপর নয়। তবে এই বইখানিকে অতি যত্নে গোপনে রাখতে হবে। সাধারণতঃ শ্রেণী-শিক্ষক বা বিশেষ কোন শিক্ষকেরই এই বইখানি অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় ভ'রে তুলতে চেষ্টা ক'রতে হবে। তবে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে ক'রতে হ'লে চাই শিক্ষকের নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি। এর মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ —তার সাফল্য, অসাফল্য, তার ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য—সব-কিছুই।

সময়-তালিকা

তাই পাঠ্য-তালিকার সঙ্গে সময়-তালিকার প্রশ্ন জড়িত। কোন্ বিষয় বিদ্যালয়ে দিনের কোন্ সময় শিক্ষার্থীরা প'ড়বে, সে বিষয়ে একটি কর্ম্মসূচী

প্রণয়ন করাই হ'ল সময়-তালিকার উদ্দেশ্য। এরূপ সময়-তালিকার মূল্য যথেষ্ট। কারণ সময়-তালিকাই কর্ম্মসূচীর প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিভ্রম দূর করে। এই দিনপঞ্জীই হ'ল বিদ্যালয়-জীবনের একটি বিশেষ উপকরণ। একটি নিয়ম ও নিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নির্দ্দিষ্ট পথে বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীকে রূপ দেয় এই সময়-তালিকা। তাছাড়া প্রত্যেকটি পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি যাতে সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়, যাতে বিদ্যালয়ের কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে চ'লতে পারে, সেজন্যে সময়-তালিকা নানাভাবে নানা স্থানে রাখা উচিত। সময়-তালিকাকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা চলে। যাতে বিনা আয়াসে এক নিমেষে সমস্ত বিদ্যালয়ের সময়-সূচী সম্পর্কে কারও ধারণা জন্মায়, সেরূপভাবেও নিম্নলিখিত দিকে দৃষ্টি দিয়ে সময়-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত :

(১) বিষয়-বস্তুর আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব,

(২) বিষয়-বস্তুর আপেক্ষিক কাঠিন্য,

(৩) শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও অবসাদ এবং

(৪) শিক্ষকের সংখ্যা ও গুণাবলী।

কে সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবেন ?

এই সময়-তালিকা যাঁরা প্রণয়ন ক'রবেন, তাঁদের বিশেষ নৈপুণ্য না থাকলে এই কঠিন কাজ সম্ভবপর নয়। সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই সময়-তালিকা প্রণীত হয়। ফলে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে যে সময়-তালিকা নির্দ্দিষ্ট হয়, তার পরিবর্ত্তন করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। তাই অনেক সময় বিষয়-শিক্ষকের হাতে বিষয় অনুযায়ী সময়-তালিকা প্রণয়নের ভার দিলে বোধ হয় ভালো হয়। এতে বিষয়-শিক্ষক তাঁর প্রয়োজন বুঝে সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবেন। যেমন বাংলা-শিক্ষক ব্যাকরণ-রচনা, গদ্য-পদ্যের জন্যে যখন সময়-তালিকা নির্দ্ধারিত ক'রবেন, তখন তিনি তাঁর প্রয়োজন বুঝে সময়-তালিকাকে পরিবর্ত্তিত ক'রতে পারবেন। মোট কথা সময়-তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে শিক্ষকদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কোন্ ঘণ্টায় কোন্ শিক্ষক কোন্ শ্রেণীতে কি পড়াবেন, কখন খেলা-ধূলার অবকাশ, কখন শরীর-চর্চ্চা বা পাঠাগারে প'ড়বার সময়, ক'টায় বিদ্যালয় আরম্ভ,

কখন ছুটি সব-কিছুই সময়-তালিকার মধ্যে দেখানো থাকবে। কোন বিদ্যালয়ে সমবেত প্রার্থনা বা সাপ্তাহিক বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা থাকলে, তার জন্যেও সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত।

সময়-তালিকা-প্রণয়নের নীতি—সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবার সময় অনেকগুলি কথা চিন্তা ক'রবার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কার্য্য-কলাপের কথা মনে রাখতে হবে। বৎসরে কতদিন ছুটি, দিনে কত ঘণ্টা কাজ করা সম্ভব, কোন্ বিষয়ের কতজন শিক্ষক আছেন এ-সব কথা ভুললে চ'লবে না।

কেবল কোন্ বিষয় দিনের প্রথমভাগে পড়ালে ভাল হয়, কোন্ বিষয়কে শেষে দিলেও তা শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর হয় না, বিষয়-বস্তুর কাঠিন্য অনুসারে কোন্ বিষয়কে কোন্ কোন্ ঘণ্টায় পড়ানো উচিত ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সময়-তালিকা-প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দিকেও দৃষ্টি রেখে এই সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবার প্রয়োজন।

যে কয়টি বিশেষ বিশেষ দিক লক্ষ্য ক'রবার প্রয়োজন, তা হ'চ্ছে বৎসরের মোট সময়, শিক্ষকের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যালয়ের সংগঠন

পাঠ্য-বহির্ভুক্ত কার্য্যাবলী

কাজ কিংবা খেলা যাই হোক না কেন, সবখানেই শিশুর আনন্দের মূল সুরটি যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে যাতে শিশুর নানাভাবে অভিজ্ঞতা জন্মাতে পারে, সেজন্যে পুস্তকহীন শিক্ষার মূল্য কম নয়। খেলা-ধূলার মাধ্যমে শিশুরা যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ লাভ করে, তা তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে তোলে। তাই শ্রেণীর পড়াশুনা ছাড়াও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রেণী-পাঠনের বাইরে যে-সব কাজের ব্যবস্থা করা উচিত, সেগুলিকে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) খেলা-ধূলা ও শরীর-চর্চ্চা ;

(খ) শিল্পকাজ ও সৃজনাত্মক কর্ম্ম ;

(গ) আনন্দ-উৎসব ;

(ঘ) সামাজিক কাজ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে যে, আজ বিদ্যালয়ের কাজ কেবল পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সব কাজ আজ বিদ্যালয়-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ বিদ্যালয়-জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এইসব কাজের উদ্দেশ্য হবে—

(১) ব্যক্তিত্ব-নিরূপক গুণাবলীর বিকাশ ও আবিষ্কার ; এবং

(২) দেহ-মনের পরিপুষ্টি।

ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট ক'রতে হ'লে নিম্নলিখিত গুণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে :—

(১) আত্ম-বিশ্বাস, (২) সহযোগিতা ও মানব-প্রীতি, (৩) দায়িত্ববোধ, (৪) মৌলিক চিন্তাশক্তি ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, (৫) বিচার-শক্তি এবং (৬) নির্ভীকতা।

খেলা-ধূলা ও শরীর-চর্চ্চা—বিদ্যালয়ের রুদ্ধ পরিবেশের অন্তরালে শিক্ষার্থীর প্রাণ অনেক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। তাই নানাপ্রকার খেলা-ধূলার প্রবর্ত্তন ক'রে বিদ্যালয়-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। খেলা-ধূলার মধ্যে শিশু যে আনন্দ পায়—তা তার শিক্ষার পথকে সুগম ক'রে দেয়। খেলা-ধূলার মাধ্যমে শিশুর শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনা ও সহযোগিতা গ'ড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেরাই শৃঙ্খলার জন্যে আইন প্রণয়ন ক'রে থাকে। শিশুরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীর নানারকম সহজাত বৃত্তি খেলা-ধূলার মধ্যে পরিমার্জ্জিত হয়। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ভাব নানারকম ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্মেষিত হয়। আবার খেলা-ধূলা শিশুমনে কেবল আনন্দেরই সন্ধান দেয় না, দেহ-মনকে সুস্থ ও সবল ক'রে তোলে। মোট কথা, যত রকম পাঠ্য-বহির্ভুক্ত কার্য্যাবলী আছে, তার মধ্যে খেলা-ধূলার স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। এই প্রসঙ্গে বয়েজ স্কাউট, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতিরও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্প-সাহিত্য ও সৃজনাত্মক কার্য্য--খেলা-ধূলা ছাড়া সাহিত্য-প্রকাশ ও অনুরূপ সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিণতি লাভ করে।

তাঁত বোনা, সুতা কাটা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, ছবি আঁকা প্রভৃতি নানা কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থী যথেষ্ট আনন্দ পায়। ফলে তারা আনন্দের সঙ্গে এই সব কাজ ক'রে অবসর মুহূর্ত্তকে সার্থক ক'রে তোলে। এই সব কাজের মাধ্যমে কেবল দৈহিক উন্নতিই হয় না, বুদ্ধির পরিচালনা, রুচি-গঠন ও মনের উৎকর্ষ-সাধনে এই কার্য্যের মূল্য অনেকখানি। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলবার পথে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের গল্প বা ছড়া রচনায় উৎসাহিত ক'রতে হবে। কেউ কেউ এই সব গল্প, কবিতা সংগ্রহ ক'রে শ্রেণী-পত্রিকা সম্পাদনা ক'রতে পারে। যেমন শ্রেণীর পত্রিকা থাকবে, তেমনি বিদ্যালয়ের প্রাচীর-পত্রের প্রবর্ত্তন ক'রতেও শিশুদের উৎসাহিত করা দরকার।

তাছাড়া, আত্ম-প্রকাশের পথে সহায়তা ক'রতে হ'লে অভিনয় ও বিতর্ক সভার আয়োজন ক'রতে উৎসাহিত ক'রতে হবে।

আনন্দ-উৎসব—বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার লক্ষ্য কেবল মানুষকে চিন্তাশীল করাই নয়, তাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী ও কর্ম্মঠ ক'রে তোলা।

এই লক্ষ্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌ই সজাগ। শিক্ষার এই লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট হ'য়েই রবীন্দ্রনাথ গ'ড়েছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন, গান্ধীজি গ'ড়ে তুললেন তাঁর সেবাগ্রাম।

জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। তাই বাস্তবের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে শিক্ষা-সূচীকে প্রণয়ন ক'রতে হবে। বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়লে শিক্ষা হবে অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ।

কর্ম্মই হ'চ্ছে জীবনের গান। জীবন ছন্দোময় হ'য়ে ওঠে কর্ম্মেরই কল্যাণে। তাই ত কর্ম্মকে যোগ বলা হ'যেছে। কর্ম্মই আনে প্রাণের স্পন্দন, কর্ম্মই জাগিয়ে দেয় মানুষের সুপ্ত শক্তিকে। আপন সত্তার অনুভূতি হয় কর্ম্মেরই মাধ্যমে। তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়ার মূল্য অপরিসীম ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে।

অনেক সময শিল্পকাজে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ আরও প্রবল হয়, কারণ এর মধ্যে আছে সৃষ্টির উন্মাদনা। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হয় শিল্পকাজের মাধ্যমে। জ্ঞানকে বাস্তবের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে গ'ড়ে তোলাই হ'ল শিল্পকাজের বড় সার্থকতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তার, দেহ-মনের পরিপুষ্টি, সব-কিছুই সম্ভবপর হয় এই শিল্পকাজের কল্যাণে।

শিল্প সম্পর্কে একটি কার্য্যক্রম থাকা উচিত। যেমন—

(১) কাজের মধ্যে শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে।

(২) সহজ থেকে কঠিন কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

উপকরণ :—

টুকিটাকি জিনিস থেকে সুরু ক'রে সব-কিছু উপকরণই কাজে লাগতে পারে। কি ক'রে সামান্য জিনিসগুলিকে কাজে লাগানো যায়—কি ক'রে ছোট কাঠ বা কাগজের টুক্‌রা, টিনের বাক্স ও টুক্‌রা টুক্‌রা চট বা চামড়াকে সুন্দর রূপ দেওয়া যায়, তা দেখিয়ে দেওয়াই হ'ল শিল্প-শিক্ষকের কাজ।

শিল্পকাজে অভ্যাসের ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক গুণের বিকাশ ঘটে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য—এই কাজের পাথেয়। শুধু তাই নয় যৌথ দায়িত্ববোধেরও এই কাজে বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এই শিল্পকাজকে কেন্দ্র ক'রে অনেক বিষয়-বস্তু সরস হ'য়ে ওঠে। সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্য-বিষয় কাজের মাধ্যমে শেখানো যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর যদি ভাষা কিংবা অঙ্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পরবর্ত্তী কালে শিক্ষার্থীর চিন্তার স্পষ্টতা আসবে ও জ্ঞানের ভিত্তি হবে পাকা। সেইজন্যে হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দিলে শিল্প-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিল্পকেন্দ্রিক করার সার্থকতা।

শিক্ষায় চারু-শিল্প ও হাতের কাজ

গীতি ও নৃত্য—মানব-জীবনে গীতি-নৃত্যের মূল্য সম্পর্কে আজও অনেকে সংশয় পোষণ করেন। কিন্তু নৃত্যই প্রাণধর্ম্মের পরম প্রকাশ, সভ্যতার চরম অবদান। গীতির মাধ্যমেই প্রাণের স্ফূর্ত্তি, মনের বিকাশ।

গীতিকেই কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে সংস্কৃতির তাজমহল। সঙ্গীত জীবনের ছন্দোময় রূপ।

তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

তাই আনন্দের সন্ধান মেলে সঙ্গীতের মাধ্যমে। আর সেই আনন্দ শিক্ষাকে সহজ ক'রে তোলে। সাবলীল ছন্দ শিশু ও কিশোরদের প্রাণকে মাতিয়ে তোলে। ছন্দে ছন্দে দুলতে থাকে তাদের হৃদয়। সুরের আকর্ষণ, ছন্দের আবেদন প্রবল। তাই যা-কিছু কানে বাজতে থাকে, তাই মনে তুফান তোলে।

শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। রসের আবেদনে সে মন সজীব হ'য়ে ওঠে।

কেবল কল্পনার বিকাশেই নয়, আদর্শের উদ্বোধনে সঙ্গীতের প্রভাব সামান্য নয়।

মনের মণিকোঠায় গীতির মূর্চ্ছনা সোনার কাঠির মত সুন্দরের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীতের স্থান—গীতিধর্ম্মকে বাদ দিয়েও জাতীয় সঙ্গীতের বিশেষ একটি মূল্য আছে। দেশপ্রীতির আদর্শ উদ্‌বুদ্ধ করে এই জাতীয় সঙ্গীত। মন ভ'রে ওঠে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তিতে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়েই জাতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন হওয়ার প্রয়োজন।

শ্রদ্ধাভরে সুস্পষ্টভাবে জাতীয় সঙ্গীতকে ধ্বনিত ক'রে তুলতে হবে। দরদ দিয়ে অবনতশিরে এই সঙ্গীত গাইতে হবে। অন্তরের স্পর্শে গীতি হ'য়ে উঠবে সার্থক।

কাজ ও খেলা

মন আমাদের চঞ্চল, তাই সব সময়ে কোন-না-কোন বিষয়ে সে নিযুক্ত থাকতে চায়। চুপ ক'রে ব'সে থাকলেও নানারূপ চিন্তা এসে ভিড় করে। সে সব চিন্তা অনেক সময় এলোমেলো, সুতরাং নিষ্ফল। পরিশ্রম না ক'রলে দেহ যেরূপ অকেজো ও স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়ে, মনও সেরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়। মন ও দেহকে ব্যস্ত রাখতে হবে। মন নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকতে চায়। যে সব বিষয়ে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী সেই সব কাজই সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে ক'রতে চায়, সেই কাজ হ'তেই সে আনন্দ লাভ করে। চপল শিক্ষার্থী লেখাপড়ার চেয়ে খেলা ক'রতে বেশী ভালবাসে, কারণ খেলাতে তার আনন্দ বেশী। যে খেলা সে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ক'রতে পারে না সে খেলাতেও সে আনন্দ পায় না, তাতে তার উৎসাহও থাকে না। সে খেলা তার কাছে কাজের সামিল হ'য়ে পড়ে। আবার কোন ছেলেকে যদি তার ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ দেওয়া যায়, সে কাজ সে সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রবে, কারণ তাতে থাকবে তার উৎসাহ ও আনন্দ। কাজও হ'য়ে যায় খেলা, যদি তা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সম্পন্ন হয়। আবার খেলাও কাজে পরিণত হয় যদি তা

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়। কাজেই শিশুর মনের বিকাশ বা দেহের স্বাস্থ্য উন্নীত ক'রতে হ'লে প্রথমে তার মনের গতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সব কাজে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী—সে সব কাজের ভিতর দিয়েই তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হ'লে সে স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে।

মন সম্বন্ধে যা সত্য দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। উৎসাহ ও আনন্দ-বর্দ্ধক না হ'লে শিশুরা অঙ্গ-সঞ্চালনেও কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না। সুতরাং তাদের স্বাস্থ্য গঠিত হ'তে হ'লে তারা যাতে আনন্দ পায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের দেহ-গঠনের উপযোগী ব্যায়াম নির্ব্বাচন ক'রতে হয়। আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতি এইজন্যে শিশুকেন্দ্রিক হ'তে চ'লেছে। মানসিক বা দৈহিক সব শিক্ষাই আজ শিক্ষার্থীর মন, ইচ্ছা, আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে। খেলাই হউক বা পড়াই হউক, একভাবে অধিকক্ষণ চ'ললে দেহের ও মনের অবসাদ আসে। কাজেই এদের ফাঁকে ফাঁকে দরকার হয় বিরতির। ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষার্থী আঁকবে চিত্র, গাইবে গান, অনুসন্ধান ক'রবে নানা বিষয়ে। এর ফলে এদের মন কোনও বিশেষ বিষয়ে আকৃষ্ট হবে। জাগবে আগ্রহ, একাগ্রতা। ঐকান্তিকভাবে কাজ করার দরুণ জীবন হবে সার্থক।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ৫।৬ ঘণ্টা থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়-গৃহ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কল-কারখানা ও বাজার হ'তে দূরে, ঘিঞ্জি পল্লীর বাইরে, উন্মুক্ত স্থান বিদ্যালয়ের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। ব্যায়াম ও খেলার জন্য মাঠ থাকা আবশ্যক। সেখানে থাকবে ফুলের বাগান ও গাছ। বিদ্যালয় চিত্তাকর্ষক হ'লে বালকদের মন প্রফুল্ল থাকে। পরিবেশ মনোরম হ'লে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ দুই-ই শিক্ষার অনুকূল। বিদ্যালয়ের ঘরগুলি প্রশস্ত হবে। প্রতি ছাত্রের জন্য ৮ হ'তে ১৫ বর্গফুট পরিমিত স্থান থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের ৮ বর্গফুট স্থান হ'লেও চ'লতে পারে। ঘরের উচ্চতা অন্ততঃ ১১ ফুট হবে,

আলো-হাওয়ার সুব্যবস্থা থাকবে। জানালা-দরজার সংখ্যা বেশী হওয়া আবশ্যক। হাওয়ার অবাধ চলাচলের জন্য জানালা বড় বড় হবে। প্রশ্বাস-বায়ু বেরোবার জন্যে থাকবে ভেন্টিলেটর।

জলপানের ব্যবস্থা :—শহরে সাধারণতঃ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি জল সরবরাহ ক'রে থাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জলপানের জন্যে কলের ব্যবস্থা থাকা ভাল। ছাত্রদের সংখ্যানুযায়ী যথেষ্ট কল থাকলে ছাত্ররাই কল হ'তে জল পান ক'রতে পারে। প্রতি ছাত্রের জন্য আলাদা গ্লাস থাকবে। হয় নিজেরা বাড়ী হ'তে আনবে, নয়ত স্কুলে কাগজের গ্লাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে পাতকুয়ো বা নলকূপ হ'তে জলের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। গভীর নলকূপের জল বিশুদ্ধ ; কাজেই স্কুলে নলকূপ থাকা আবশ্যক। কোনও কারণে পাতকুয়োর জল ব্যবহার ক'রতে হ'লে অনেক সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হবে।

পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান :—স্কুলঘর হ'তে অন্ততঃ ২০ গজ দূরে পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান হবে এবং নিযমিতভাবে এগুলোকে পরিষ্কৃত ক'রতে হবে। পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপরিচ্ছন্ন থাকলে ছাত্রগণ হয়তো মাঠেই মলত্যাগ ক'রবে। মাঠে বা অন্য কোন ঝোপ-জঙ্গলে মলত্যাগ করলে, নানারূপ জীবাণু বিস্তারের আশঙ্কা থাকে।

স্বাস্থ্যসূচক কার্য্যাবলী ও খেলা :—স্কুলে ভর্ত্তি হবার আগে বালকদের জীবন থাকে মুক্ত ও কর্ম্মচঞ্চল। স্কুলে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের সচ্ছন্দ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। খেলা-ধূলার মাধ্যমে জীবনধারায় আসে পরিবর্ত্তন। ৫।৬ ঘণ্টা ধ'রে ব'সে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কাজেই অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন কম নয়। ঠিক সময় স্কুলে উপস্থিত হবার জন্যে তারা ৯টা, ৯॥টায় খেয়ে আসে এবং ছুটির সময় পর্য্যন্ত অনেকেরই অন্য কিছু না খেয়ে থাকতে হয়। সুতরাং স্কুলের শেষে তারা দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করে। এ অবস্থায় আনন্দদায়ক খেলা-ধূলাও তাদের আর আকর্ষণ ক'রতে পারে না। অথচ পর্য্যাপ্ত অঙ্গ-চালনার ওপর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে। কাজেই

স্কুলে খেলা-ধুলা ও টিফিনের ব্যবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতি দু'ঘণ্টা ক্লাস হবার পর ৫।১০ মিনিট বিরতি দেওয়ার প্রথা এদের পক্ষে বোধ হয় উপযোগী। ছাত্রদের বয়সানুযায়ী খেলার নির্ব্বাচন করা দরকার।

স্কুলের আসবাবপত্র—স্কুল-ঘরের ডেস্ক ও বেঞ্চ ছাত্রদের উপযোগী হবে। পায়ের পাতা সম্পূর্ণ যাতে মেজেয় রাখা যায় সেই অনুযায়ী উঁচু হবে। চেয়ার আরামপ্রদ ও ব্ল্যাকবোর্ড পরিচ্ছন্ন হবে, আর ঘরের মেজে হ'তে প্রায় ২৭ ইঞ্চি উঁচুতে থাকবে। ছাত্রগণের চোখের সামনের দেওয়ালের রঙ হবে ফিকে। সাদা রঙ চোখে ধাঁধাঁ লাগায়। বাঁ দিক হ'তে ঘরে আলো আসার ব্যবস্থা থাকবে। ডেস্কের উচ্চতা সম্মুখের দিকে বুক পর্য্যন্ত হবে, আর তার আকার হবে সামনের দিকে ঢালু। ব্যায়ামের জন্য থাকবে জিমনাসিয়াম্। তাতে নিম্ন-তালিকানুযায়ী সরঞ্জাম থাকার প্রয়োজন :—

৩০ বা ৪০ জোড়া হাল্কা মুগুর,

৩০ বা ৪০ জোড়া কাঠের ডাম্বেল,

৩ জোড়া প্যারালাল বার (বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট),

১টি ভল্টিং বক্স—স্প্রিং বোর্ড—ম্যাট্ বা গদি,

৩টি হরাইজণ্টাল বার (বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট),

৩০ বা ৪০টি ছোট আকারের মাদুর, খালি হাতে ব্যায়ামের জন্য কয়েকটি টেনিশ বল, তেঁতুল বীচি বা মটর বীচি-ভরা কয়েকটি থলি,

দৌড়ানো, লাফ বা ছোঁড়া প্রভৃতির জন্য সরঞ্জাম,

২টি উচ্চলম্ফের পোষ্ট (High jump post),

১টি দড়ি বা বাঁশ,

১ পোলভল্টের পোষ্ট এবং পোল,

২ খণ্ড কাঠ (একটি অর্দ্ধ-বৃত্তাকার লৌহ গোলক নিক্ষেপের জন্য)।

তাছাড়া হকি, ফুটবল, ভলিবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম থাকবে। এছাড়া থাকবে ওজন নেবার যন্ত্র, উচ্চতা মাপবার জন্য কাঠের পোষ্ট, ষ্টপ ওয়াচ, মাপবার ফিতা, প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ ও যন্ত্র।

শিক্ষার পূর্ণতার জন্ত ব্যায়াম অপরিহার্য্য। ব্যায়াম ও খেলার ভিতর দিয়ে বালকেরা সহযোগিতা, সুষ্ঠু অঙ্গভঙ্গী, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতির অভ্যাস করে। এই সব অভ্যাসের ফলে সে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে। স্কুলের কার্য্য-তালিকার মধ্যে যাতে প্রতি ছাত্র প্রতিদিন অন্ততঃ বয়সানুযায়ী ২০ হ'তে ৪০ মিনিট দৈহিক এবং স্বাস্থ্য শিক্ষায় নিযুক্ত থাকে, সে প্রকারের কার্য্যসূচী থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী খেলা (যথা—ঘোড়ার মত দৌড়ানো, হাঁস বা কাকের মত চলা ইত্যাদি) থাকা উচিত। গল্পের মাধ্যমে নানারূপ অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভবপর। এখানে শিক্ষক গল্প ব'লে যাবেন, তাঁর সাথে ছাত্রগণ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সেগুলো অভিনয় ক'রবে।

এ বয়সের ছেলেরা কল্পনাপ্রবণ। কাজেই সেরূপ খেলাতেই এরা আনন্দ পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার মধ্যে থাকবে মার্চ্চ করা, যাতে ছাত্রগণ সোজা দাঁড়াতে বা চলতে শেখে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম, অল্পস্থানের মধ্যে ছোটখাট খেলা, বয়স ও দক্ষতা অনুযায়ী নানারূপ কসরৎ কিংবা জিমনাষ্টিক জাতীয় ব্যায়াম ও হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে প্রবর্ত্তিত ক'রতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা এত ভারাক্রান্ত যে, এই অতি-প্রযোজনীয় শিক্ষার জন্য প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় দেওয়াও মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই সচেতন, কিন্তু তার জন্য এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা হ'য়ে ওঠেনি।

তাই প্রয়োজন হ'লে স্কুলের কার্য্যসূচীর পরিবর্ত্তন করা দরকার। খাবার পরেই ব্যায়াম করা ঠিক নয়, শেষের দিকেই ব্যায়ামের সময় নির্দ্ধারিত ক'রতে হবে। অথবা সকাল-বিকেলে স্কুলের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। দূরাগত ছাত্রেরা খাবার নিয়ে আসবে, নতুবা বিদ্যালয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। মামুলী ভাবে চলাতে প্রতি বৎসর শক্তির অপচয়ই হয়।

সমাজ সংসারের কাজে যোগ্য ক'রে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী হ'লে তবেই আসে আত্ম-প্রত্যয়, সাহস ও কাজের প্রেরণা।

দেহের পরিপোষণ—সুসম খাদ্যের দ্বারাই আমাদের দেহের পরিপুষ্টি হয়। খাদ্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা দরকার। খাদ্য আহরণ প্রকৃতই আয়াস-সাধ্য ও সুখাদ্য-সংগ্রহ ব্যয়বহুল। সর্ব্বত্র সকল প্রকারের খাদ্যও লভ্য নয়। তাছাড়া সব ঋতুতে সব প্রকারের খাদ্য পাওয়া যায় না। অথচ যথোচিত এবং সুসম খাদ্যের ব্যবস্থা না ক'রতে পারলে শরীর পুষ্ট হয় না, নানারূপে রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের যথাযথ পুষ্টি না হ'লে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি কমে যায় এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। শরীরের পরিপোষণ সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে বয়স, পরিশ্রম ও নরনারী-বিভেদের উপর। ১৬ বৎসরের বালকদের, বালিকাদের অনুপাতে, অধিক খাদ্যের প্রয়োজন। উপরন্তু খাদ্য যথোচিতই হউক বা সুসম হউক, এক প্রকার খাদ্য অধিক দিন খেলে রুচির বিকৃতি ঘটায়, সেইজন্য খাদ্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ঋতুভেদে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো উচিত। গ্রীষ্ম বা বর্ষা অপেক্ষা শীত ঋতুতে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাজেই গরমকালে যে পরিমাণ খাদ্য খেয়ে আমরা হজম করতে পারি, শীতকালে তার চেয়ে বেশী খাদ্য আমাদের হজম হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রন্ধন-প্রক্রিয়ার উপরও খাদ্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। মাংস বা প্রোটীন-বহুল অতি-আবশ্যকীয় খাদ্য নানাবিধ মসলা-সংযোগে রান্না ক'রলে তা দুষ্পাচ্য হ'য়ে ওঠে। কাজেই এই সব বিষয় বিবেচনা ক'রে আমাদের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত ক'রতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা

স্বাস্থ্যই জীবনে আনন্দের উৎস। বেঁচে থাকতে হ'লে চাই সুস্থ ও কর্ম্মঠ জীবন। রুগ্ন শরীরে যদি সব সময়ে প্রাণ থাকতে প্রাণান্ত হ'তে হয়, তবে সে জীবনে সুখও নেই—আনন্দও নেই। কাজেই স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলো দ্বিধাহীন হ'য়েই দূর ক'রতে হবে। প্রতি বৎসর এমন অনেক মৃত্যু হয় যেখানে হয়ত তা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। জীবনের এই দারুণ অপচয় শুধু পরিবারেই দুঃখ আনে না, জাতির উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। এই অপচয় নিবারণ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

স্বাস্থ্যই জাতি ও দেশের সম্পদ। স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জাতি দেশের ভার-স্বরূপ। স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় সার্থক হয়। তাই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ দুটি—একটি অনভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অবহেলা। কাজেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপনের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। শুধু নীতি মুখস্থ ক'রেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। যাতে এই নিয়মগুলির অভ্যাস হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক; কারণ অনেক মাতাপিতা যে-কোনও কারণেই হউক তাঁদের সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন এবং অনেক বাড়ীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে শিশু ও যুবাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপদেশ দান।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো যাতে তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে দৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হয়, ছাত্র-জীবনে বা তার পরবর্ত্তী অবস্থায়ও যাতে তারা এই নিয়মগুলো মেনে চ'লে প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী হ'য়ে নিজের জীবন আনন্দময় ক'রতে পারে এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধন ক'রতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি মাতাপিতা বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তির দৃষ্টি থাকবে। যাতে তাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সযত্ন হন, বাড়ীঘর পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট থাকেন, তা দেখতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রয়োজনীয়তা শুধু উপদেশ দিয়েই বোঝালে চলবে না। প্রত্যেক ছাত্র যাতে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্ত্তিতার মতোই পরিচ্ছন্নতা-বোধ ছাত্রদের মনে সজাগ ক'রে দিতে হবে। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন ক'রলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় অথচ এর জন্ত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ক'রতে হয় না। ছাত্রদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার। প্রত্যেকে যেন বিদ্যালয়ে পরিষ্কার হ'য়ে আসে, চুল আঁচড়াবে, প্রত্যহ দাঁত মাজবে, স্নান ক'রবে, কাপড়-জামা পরিষ্কার ও পরিপাটী রাখবে।

ভোরে ওঠা

ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। অতি অল্প আয়াসেই এটি অভ্যাসে পরিণত করা যায়। অভ্যাসে পরিণত হ'লে তখন আর ভোরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। রাত্রে নিদ্রার পর শরীরের মাংসপেশীর ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়, স্নায়ু সতেজ, মন প্রফুল্ল থাকে, সমস্ত দেহ আবার দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হয়। এ সময়ে শয্যা ছেড়ে না উঠলে দেহের কাজ ক'রবার ক্ষমতা নষ্ট হ'তে থাকে। অধিক দিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকার অভ্যাসের ফলে মানুষ অলস ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে।

দেহকে কার্য্যক্ষম রাখতে হ'লে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের অভ্যাস ও ভোরে ওঠার অভ্যাস ক'রতে হবে। ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশ মলে পরিণত হয়, ইহা অত্যন্ত দূষিত ও বিষাক্ত। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শরীর হ'তে নির্গত না হ'লে এই বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে অনেক জটিল ও মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। বাড়ীতে আবর্জ্জনা জমে থাকলে তাতে যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা দেখলে মনে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হ'লে সেরূপ স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অধিক দিন কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ফলে মন নিরানন্দ ও উৎসাহহীন হ'য়ে পড়ে,

কাজ ক'রবার ক্ষমতা থাকে না, হজম-শক্তির লোপ পায় ও দাঁতের রোগ সৃষ্টি হয়, মাথার যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং অতি শৈশব হ'তেই যাতে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সেই দিকে প্রত্যেক মাতাপিতা বা শিক্ষকদের দৃষ্টি থাকা দরকার। প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ অভ্যাসের ফলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হ'য়ে যায়। এর পর হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ভোরের নির্ম্মল বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসলে শরীর ও মন ভাল থাকে।

দেহ ও মনের সুসামঞ্জস্যের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা দেহ সুগঠিত ও কান্তিময় হয়, স্বাস্থ্য ভাল ও মন প্রফুল্ল থাকে। ক্রমশঃ দেহের শক্তি-বৃদ্ধি, গতির ক্ষিপ্রতা আসে। দেহের অভ্যন্তরে যন্ত্রসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে ও রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ওপর ব্যায়ামের প্রভাব হিসাবে ব্যায়ামকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ

পুষ্টিসাধক ব্যায়াম—ইহা দ্বারা দেহের উন্নতি সাধিত হয়। মাংসপেশী দৃঢ়, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। বার,ঃ ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদির সাহায্যে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই ব্যায়াম করা উচিত। খালি হাতে ব্যায়ামের মধ্যে ডন, বৈঠক, কুস্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দৌড়ানো, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলম্ফন প্রভৃতি ক্ষিপ্রতা-বৃদ্ধিকারক ব্যায়াম এই পর্য্যায়ভুক্ত।

শরীর-গঠনকারী ব্যায়াম—কোন অঙ্গ স্বাভাবিক না থাকলে ব্যায়াম দ্বারা দেহের সে দোষ দূর করা যায়; যেমন—চেপ্টা পায়ের পাতা দিয়ে হাঁটা-চলা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা পায়ের এই দোষ দূর করা যায়। শোওয়া, বসা, চলা-ফেরার দোষে অনেক সময় মেরুদণ্ড বক্রাকৃতি ধারণ করে। ব্যায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। প্রথম অবস্থায় এদিকে লক্ষ্য না রাখলে পরিণামে কুফল ফলে, দেহ কুঁজো হয়; ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ার ফলে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে।

আমোদজনক ব্যায়াম—নানারূপ খেলার দ্বারা মন ও শরীরের স্ফূর্ত্তি হয়। কোন্‌ পরিস্থিতিতে কিরূপ খেলা উচিত—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে ঠিক ক'রে

ফেলতে পারে সেই পাকা খেলোয়াড়। মনের ক্ষিপ্রতা না হ'লে ভাল খেলোয়াড় হ'তে পারে না। খেলার দ্বারা বালকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ ক'রতে শেখে, নিয়ম মেনে চ'লতে শেখে।

নানারূপ কৌতুক-কসরৎ—এই ব্যায়ামের দ্বারা সূক্ষ্ম মাংসপেশীসমূহ সতেজ হয়। সূক্ষ্ম মাংসপেশী আয়ত্তে থাকলে এই সব কাজ করা যায় এবং অভ্যাসের দ্বারাও এই সব মাংসপেশী আয়ত্তে আনা যায়।

সুষ্ঠু ভঙ্গীর জন্য ব্যায়াম—সোজাভাবে চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা দেহ সুগঠিত হয়। নানাপ্রকার ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের মাংসপেশী শক্তিশালী হয়।

মাংসপেশীর ওপর ব্যায়ামের প্রভাব—ব্যায়ামের সময় রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি হওয়ায় মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মাংসপেশী সজীব থাকে, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুততর হয় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দৃঢ় হয়।

হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুততব হওয়ার দরুণ ফুস্‌ফুস্‌ও অধিক অম্লজান গ্রহণ করে, রক্তশোধন-কার্য্যও দ্রুততর হয়।

ব্যায়ামের দ্বারা হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ভুক্ত দ্রব্য ভাল হজম হওয়াতে শরীরের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, শরীর উত্তপ্ত হয়—ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি খুলে যায়, ঘর্ম্মের সঙ্গে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

শিশু যখন বসতে বা দৌড়াতে শেখে, তখনই তার বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমাবস্থায় যদি ঠিকভাবে দৌড়াতে বা বসতে না শেখে, তবে কতকগুলো দুষ্ট ভঙ্গী আয়ত্ত হ'য়ে যায়। পরে এই ভঙ্গী শোধরানো শক্ত হ'য়ে পড়ে। কতকগুলো মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে আমরা দাঁড়াই, চলি। মাংসপেশীগুলো যাতে দেহকে পুষ্ট রাখতে পারে সেই ভাবে অভ্যাস করা দরকার। অনেকে এক কাঁধ উঁচু ক'রে আর এক কাঁধ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কেহ বা মুখ এগিয়ে দিয়ে একটু কুঁজো হ'য়ে দাঁড়ায়। অধিক দিন এরূপ দাঁড়াবার অভ্যাসের ফলে মেরুদণ্ডে একপ্রকার বাঁকের সৃষ্টি হয়।

দাঁড়াবার নিয়ম—সোজা হ'য়ে দু'পায়ের ওপর দেহের ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। মাথা উঁচু ক'রে, সোজা বুক এগিয়ে ও পেট ভিতর দিকে টেনে দাঁড়ালে ভালো দেখায়। এরূপ দাঁড়াবার ফলে দেহ সুঠাম হয়, মনে নিশ্চয়তার ভাব আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

বসবার নিয়ম—বসবার সময় দু'কাঁধ সমান রেখে শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসার অভ্যাস ক'রতে হয়। কখনও সামনে ঝুঁকে বসতে নেই। পড়ার সময় দুই চোখের থেকে এক ফুট দূরে রেখে বই পড়তে হয়। বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়তে নেই। শোবার সময় দেহ সোজা ক'রে এক পাশ ফিরে শোওয়ার অভ্যাস করা দরকার। মাথার বালিশ নরম হ'লে ভাল হয়। খুব শক্ত বা খুব নরম বিছানাতে শোওয়া ভাল নয়।

ভঙ্গীর দোষে দেহ নানারূপ অস্বাভাবিকভাবে গঠিত হয়। দেহ প্রসারিত না হ'লে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। ফলে তাদের কাজ ব্যাহত হয়। কোন সময়ে যদি তলপেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও পিঠ পিছনে এগিয়ে পড়ে, তাহ'লে পরিপাক সহজভাবে হয় না এবং উদরাময় ইত্যাদি রোগ হ'তে পারে। দুষ্ট ভঙ্গীবিশিষ্ট লোক অনেক সময় অপরের কৌতুকের পাত্র হয়।

ভোরে ওঠার ন্যায় রাত্রি অধিক হবার আগেই ঘুমুবার অভ্যাস ক'রতে হয়। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বয়সানুযায়ী যথেষ্ট নিদ্রার প্রয়োজন। সুনিদ্রাতে দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়। ভোরে প্রফুল্লচিত্তে ওঠা যায়। কাজেই ঘুমুবার সময় মনকে সমস্ত চিন্তা হ'তে মুক্ত করা দরকার। চিন্তাভারাক্রান্ত মনে সুনিদ্রা সম্ভব নয়। পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আবশ্যক। নিদ্রাতে দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়, তাই রাত-জাগা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। নিদ্রার সময় ঘরের জানালা খুলে রাখা দরকার, যাতে অবাধে বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে চলাচল ক'রতে পারে। শোবার ঘরে বেশী আসবাবপত্র রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল। অত্যধিক জিনিসপত্রে শোবার ঘর বোঝাই থাকলে সেই ঘরে বাতাস চলাচলের বিঘ্ন হয়। ঐ সব ঘরে দুর্গন্ধ হয়। এক বিছানায় বেশী লোক শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শোবার ঘরের পারিপার্শ্বিক

অবস্থাও ভাল হওয়া দরকার। ঘরের পাশে যাতে আবর্জ্জনা জমে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। ঘরের পাশের ড্রেণ হ'তে দুর্গন্ধ বের হ'লে বা আবর্জ্জনার স্তূপ থাকলে বায়ু দূষিত হয়। ঘরের দেওয়ালে ভাল ছবি দু'একখানা থাকলে তা মনের প্রফুল্লতা আনে।

নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা—ভাঙা ও গড়া প্রকৃতির নিয়ম। দেহের মধ্যেও চলেছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা। দিনের পরিশ্রমে শরীরে চলে ভাঙন, রাতের বিশ্রামে সুরু হয় আবার তার গঠন। সমস্ত দিন নানা কাজে শরীরে ক্ষয় হয় প্রচুর, সেই ক্ষয়পূরণের জন্য চাই বিশ্রাম। বিশ্রামের জন্য চাই সুনিদ্রা। দিনের পরই শ্রান্ত মাংসপেশী ও ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হ'য়ে আসে। তখন তাদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত রাখা অসঙ্গত। কাজেই রাত্রি অধিক হবার আগেই আহার শেষ ক'রে নিদ্রা যাওয়া বিধেয়। নিদ্রার পূর্ব্বে আহারের পরিমাণ হবে কম। শরীর থাকবে স্নিগ্ধ, মন হবে প্রফুল্ল। নিদ্রার সময় সোজা এক পাশ হ'য়ে শুতে হয়। চিত হ'য়ে শুয়ে থাকা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অনেক সময় চিত হ'য়ে বুকের ওপর হাত রেখে শুলে ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটে। সোজা হ'য়ে ডান পাশ ফিরে শোওয়া সমীচীন, কারণ তাতে হৃৎপিণ্ডের ওপর অযথা চাপ পড়ে না। নিদ্রার সময় মস্তিষ্ক পায় বিরতি। ফলে রক্ত-চলাচল তখন মাথা হ'তে দেহতেই চলে বেশী। দেহ হয় উত্তপ্ত। এজন্য দেখা যায়, গরমের দিনে ঘুমুলে গা ঘর্ম্মাক্ত হয় ও শীতের দিনেও ঘুমের পর শীতের তীব্রতা যায় কমে। পা ঠাণ্ডা থাকলে কিংবা মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকলে সহজে ঘুম আসে না। সেইজন্য সহজে ঘুম না আসলে, পা গরম জলে ধুয়ে নেওয়া ভাল। চোখে, মুখে বা ঘাড়ে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিলেও সহজে ঘুম আসে।

ঘুমুবার আগে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হ'য়ে কোন একটি বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করা দরকার। এজন্যই নিদ্রার পূর্ব্বে সৎচিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

নিদ্রার সময়ও যাতে নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে, তা অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করা খুবই খারাপ অভ্যাস।

এই অভ্যাসের ফলে মুখ-গহ্বরের পিছনে যে অ্যাডিনয়েড গ্লাণ্ড আছে তা ক্রমশঃ স্ফীত হ'য়ে মুখ ও কানের সংযোগনল বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে এবং তাতে কালা হ'য়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শিশুকাল হ'তে মুখ বুজে শোওয়ার অভ্যাস করা দরকার, যাতে নিশ্বাসের কাজ নাকের দ্বারাই হয়।

নিদ্রা ছাড়াও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'লেই বিশ্রাম করা দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও দেহ নানা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্রম ও বিশ্রাম দুই-ই সমভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল। তাই রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসকগণ শুয়ে থাকতে উপদেশ দেন।

বিশ্রামের সময় সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, মন হ'তে সমস্ত চিন্তা দূর ক'রতে হবে।

অনেক সময় কার্য্যান্তর দ্বারাও বিশ্রামের প্রয়োজন সাধিত হয়। বিদ্যালয়ে ১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া ক'রবার পর ছাত্রগণ স্বভাবতঃই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। ছুটির পর তারা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে খেলা-ধুলাতে মেতে যায়। এইরূপে মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও দেহের পরিশ্রমের লাঘব হয়। যাঁরা ব'সে শুধু লেখাপড়ার কাজ ক'রে থাকেন, তাঁদেরও অফিস হ'তে ফিরে নানারূপ খেলা-ধুলা করা ভাল। তাঁরাও শরীরের পরিশ্রম দ্বারা মনের ক্লান্তি এইভাবে দূর করেন। পক্ষান্তরে যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমে দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা সন্ধ্যাবেলায় পুঁথিপাঠে, কীর্ত্তনগানে ও নানা কাজে দেহের শ্রান্তি দূর করেন।

নবম অধ্যায়

শিক্ষায় পরিদর্শন

ইংলণ্ডে একসময় নিয়ম ক'রল যে, পরিদর্শকরা এসে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা নেবেন। আর সেই পরীক্ষার ফলের ওপর স্কুলগুলোর মান নির্ভর ক'রবে। ফলাফলের ওপরই স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য পাওয়া নির্ভর ক'রত। কালক্রমে এ ব্যবস্থা উঠে যায়। এখনকার দিনে পরিদর্শকের কাজ হ'চ্ছে স্কুলের কার্য্যাবলীর ওপর নজর রাখা যাতে স্কুলের মান নিম্নগামী না হয়। স্কুল-গৃহ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, স্কুল রেকর্ড প্রভৃতি ঠিক থাকে কিনা, সে সম্বন্ধে পরিদর্শকরা সচেতন থাকবেন।

আমাদের দেশে এখন স্কুলের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশী। সেই তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যাও কম। অর্থাৎ যে পরিমাণে স্কুল বেড়েছে শিক্ষা-বিভাগের কাজের পরিধি সে পরিমাণে বাড়ানো হয়নি। ফলে পরিদর্শনের কাজও ভাল হ'চ্ছে না; কারণ স্কুলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাজের চাপও যথেষ্ট বেড়েছে। আমেরিকাতে পরিদর্শকদের শ্রম-বিভাগ করা হ'য়েছে। সেখানে Superintendent-রা স্কুলের সংগঠন-ব্যবস্থার ওপরই শুধু দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন Supervisor. তবে এ ব্যবস্থা সর্ব্বদেশেই চলে না। কারণ প্রথমতঃ আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ স্কুলের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বেশী হওয়া প্রয়োজন। তা না হ'লে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশে পরিদর্শকদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাঁদের প্রথমতঃ স্কুল রেকর্ড, স্কুলগৃহ, আসবাব, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখতে হয়। এছাড়া স্কুল ফাণ্ডের টাকা খরচ কিভাবে হবে, শিক্ষকদের যোগ্যতা, ভবিষ্যতের উন্নততর শিক্ষা-প্রণালীর জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদিও ক'রতে হয়। সময় সংক্ষেপের ফলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না।

পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বেশ বেশী। প্রত্যেক পরিদর্শকেরই শিক্ষা সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। তাঁর অধীনস্থ স্কুলগুলিকে সেই নির্দ্দিষ্ট মানে উন্নত ক'রবার জন্য তাঁকে চেষ্টা ক'রতে হয়। সেজন্য স্কুলের প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংগঠনের বহু সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

পরিদর্শনের নানা পর্য্যায়ঃ

সংশোধনাত্মক (Corrective Type)—এই ধরণের পরিদর্শনে সাধারণতঃ পরিদর্শকরা স্কুল ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি খুঁজতে যান। এই ধরণের পরিদর্শন একদেশদর্শী হ'য়ে যায়। ফলে পরিদর্শনের শেষে তাঁর হাতে দোষ-ত্রুটিরই দীর্ঘ তালিকা এসে পড়ে। এতে পরিদর্শক নিজেও অসন্তুষ্ট এবং শিক্ষকরাও অসুখী হন। তাই এই ধরণের পরিদর্শনের ফল ভাল হয় না। কারণ দোষ-ত্রুটি মানুষের ধর্ম্ম। যদি সেই দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হয় আর গুণের আলোচনা মোটেই না হয়, তাহ'লে কারুরই কাজে উৎসাহ থাকবে না। তাই পরিদর্শক দোষ-ত্রুটির তালিকা যেমন ক'রবেন, কেমন ক'রে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে বিধানও দেবেন। আবার স্কুলের ভাল কাজের প্রশংসা ক'রে শিক্ষকদের উৎসাহিত ক'রবেন। তাঁর মনে স্কুল সম্বন্ধে উচ্চাশা থাকবে। তাঁর বিশ্বনিন্দুক হ'লে চলবে না। সমস্ত কাজের মধ্যে মঙ্গল দেখার শক্তি তাঁকে ধরতে হবে। অগ্রগতি নির্ভর করে যুগপৎ দোষ-ত্রুটি অপসারণের ওপর এবং ভাল কাজে উৎসাহ দানের ওপর।

নিবারণাত্মক (Preventive Type)—এই ব্যবস্থায় পরিদর্শক সংবেদনশীল মন নিয়ে পরিদর্শন করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতির জন্য শিক্ষকরা কতখানি দায়ী, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন। শিক্ষকরা কতখানি প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করেন এবং সেটা কিভাবে অপসারণ করা যায়, সে বিষয়ে তিনি সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষকদেরও বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের আগেই তাঁরা পরিদর্শকের সাহায্যে সমস্যা সমাধান ক'রতে পারেন। এর ফলে শিক্ষকরা নিজেদের সম্মান বজায় রেখে ভালভাবে স্কুল চালাতে পারেন।

সৃজনাত্মক (Creative Type)—এতে পরিদর্শকরা শিক্ষকদের প্রচুর উৎসাহ দান করেন। তাঁদের একথা বুঝিয়ে দেন যে, স্কুল ব্যবস্থার উন্নতি করাটা তাঁদেরই দায়িত্ব। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রবেন। এর ফলে শিক্ষকরা দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠেন। সুতরাং তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে ভাল কাজ দেখাতে চেষ্টা করেন। একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে ব'সে থাকলে কোনদিনই ভাল কাজ হয় না।

পরিদর্শন-নীতি—পরিদর্শকের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ নয়। ক্ষমতা থাকলেই প্রয়োগ ক'রতে হয় এই কথা যদি সবসময় তাঁর মনে হয়, তাহ'লে কোন কাজই হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার অপপ্রয়োগই হয়। পরিদর্শকের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয় শুধুমাত্র স্কুলের উন্নয়নেরই জন্য। সহকর্মীদের আনুগত্য ও সহযোগিতা না পেলে কোন কাজই হয় না। সেইজন্য সংস্কারের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীদের মতামতের মূল্য আছে। জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে হয়ত তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রতে পারেন কিন্তু সেটা হয় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাজ পেতে হ'লে পরিদর্শককে যথেচ্ছাচারী হ'লে চলবে না। পরিদর্শকের পরিকল্পনা সহকর্মীদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে তাঁরা ঐ সব কাজের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষে পরিদর্শকরা স্কুলের সংগঠন ও আর্থিক ব্যাপারেই বেশী মাথা ঘামান। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিদর্শনে যেখানে ছাত্রদের শিক্ষামান ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অন্য বিষয়ে পরিদর্শককে মন দিতে হ'লে কাজ ভাল হয় না।

পরিদর্শক হবেন নিরপেক্ষ। দোষ বা গুণ যেটা তিনি দেখবেন সেটা সরাসরি ব'লে দেবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি অনবরত ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে শিক্ষকদের বিব্রত ক'রবেন না।

পরিদর্শনের সময় স্থানীয় অবস্থার কথা পরিদর্শক অবশ্যই বিবেচনা ক'রবেন। যে স্কুলটি পরিদর্শন ক'রবেন সেই স্কুলটি তার পরিবেশে কতখানি অগ্রসর হ'তে পারে, সেকথা তিনি আগে চিন্তা ক'রবেন। কারণ অগ্রগতি একদিনেই হয় না—

সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সেখানে অধৈর্য্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি ক'রলে কোন ফলই হয় না। তাই প্রথম কয়েক মাস পরিদর্শক কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা ক'রবেন, কোন রকমের সমালোচনা ক'রবেন না। পরবর্ত্তী কয়েক মাসে বড় রকমের ত্রুটিগুলির একটি তালিকা ক'রবেন, যে সব ত্রুটিগুলির আশু অপসারণ প্রয়োজনীয়। তারপর তিনি শিক্ষকদের কাছে এই ত্রুটিগুলি জানাবেন এবং তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রবেন। পরিদর্শকের ত্রুটির তালিকা হয়ত দীর্ঘ হ'তে পারে, কিন্তু তাঁকে একসঙ্গে সব কাজ ক'রতে হ'লে বিপত্তিই বাড়বে। তাই একে একে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে। পরিদর্শককে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ ক'রতে হবে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে। তিনি সর্ব্বদা উদার মনোভাবাপন্ন হবেন। প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পনার পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনে কুণ্ঠিত হবেন না।

পরিদর্শকদের সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা উচিত। এদেশে পরিদর্শকরা শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে নজর না দিয়েই তাঁদের কাছ থেকে ভাল কাজ দাবি করেন। যদিও পরিদর্শকরা স্কুলের মানের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি দেবেন, তবুও তিনি মানবিকতা বর্জ্জিত হবেন না। যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ চালাতে হয়, সেটা তাঁরা অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ক'রবেন।

পরিদর্শনটা শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেন অপ্রীতিকর না হয়। পরিদর্শন শিক্ষকদের প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে। পরিদর্শকের দৃষ্টি হবে সমালোচনায় কিন্তু তার পেছনে থাকবে সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়।

হঠাৎ ক্লাসে গিয়েই হয়ত পরিদর্শকের কোন ভুলত্রুটি চোখে পড়ল। তিনি তখনই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সে প্রসঙ্গে ব'ললেন। কিন্তু ২।৫ মিনিটের পরিদর্শনে সমালোচনা করা যায় না। শিক্ষকের বিচারে সময় ও সতর্ক দৃষ্টি লাগে যথেষ্ট পরিমাণে। পরিদর্শক নিজে একদিন আদর্শ পাঠ দিতে পারেন। নানারকম পত্র-পত্রিকা দিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সাহায্য ক'রতে পারেন।

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ অচ্ছেদ্য। পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের দিকেও যথেষ্ট জোর দেবেন।

পরিদর্শক কেবলমাত্র সময়-তালিকা, আসবাব, গৃহ, মন্ত্রণাকক্ষ, স্কুল রেকর্ড প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষকদের কাজ ও স্কুলের প্রয়োজনীয়তার মূল্য নিরূপণ ক'রবেন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অবস্থার উন্নতি কি ক'রে করা যায় সেটা তিনি দেখবেন। এতে প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনা ক'রবার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে এভাবে পরিদর্শন হয় না।

এ গতানুগতিকতার পরিত্যাগের প্রয়োজন। পরিদর্শকের সর্ব্বদা এক-একটা আশু পরিকল্পনা ও একটা মূল পরিকল্পনা থাকবে। মূল পরিকল্পনাগুলি বেশ কিছুদিন ধরে চলবে।

(ক) প্রথমতঃ একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে বোঝা যায় যে, পরিদর্শক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, স্কুলের ত্রুটি ও নতুন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেন।

(খ) মূল আদর্শে পৌঁছানোর জন্য যে নিয়মনিষ্ঠ চেষ্টার প্রয়োজন তা-ও বোঝা যায়।

(গ) সুপরিকল্পনা প্রেরণা ও উৎসাহ বাড়ায়।

সুপরিকল্পনার নিম্নলিখিত গুণ থাকবে। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সূত্রগুলো দেওয়া থাকবে। তৃতীয়তঃ পরিকল্পনার সাফল্য নিরূপণের জন্য কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

প্রত্যেক কাজই সাফল্যের সঙ্গে ক'রতে হ'লে সুপরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিদর্শন তাই শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। উপযুক্ত-ভাবে পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রয়োজন।

দশম অধ্যায়

সহ-শিক্ষা

বর্ত্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা একটা বহু-আলোচিত সমস্যা। সহ-শিক্ষার অর্থ শুধু ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাঠ গ্রহণ নয়। সহ-শিক্ষাতে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির সময় ছেলে ও মেয়েকে সমান প্রতিযোগিতা ক'রতে হবে। স্কুলের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা সমানভাবে অংশ গ্রহণ ক'রবে। কোন পক্ষই কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ পাবে না।

পাশ্চাত্য দেশে সহ-শিক্ষার প্রচলন প্রাচীন। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার আদিযুগে সহ-শিক্ষার কথা শোনা যায়। তবে মধ্যযুগে পৃথক শিক্ষায়তনেরই বাহুল্য দেখা যায়। Reformation আন্দোলনে সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা উল্লিখিত হয়। ১৮ শতকে Pestalozzi সহ-শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেন। ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে শিক্ষালাভ ক'রলে তাদের মধ্যে সামাজিক কর্ত্তব্যে সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে ওঠে। এতে ব্যয়সঙ্কোচও হয়। এই সব কারণে আজকাল সহ-শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। আমেরিকা এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। রোমান ক্যাথলিক-প্রভাবিত দেশগুলি ছাড়া অন্যত্র সহ-শিক্ষা সাদরে গৃহীত হ'য়েছে। ঐ সব দেশে সহ-শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরেই আবদ্ধ নেই, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত।

ভারতবর্ষে আদিযুগে সহ-শিক্ষার সমস্যা মোটেই ছিল না। কারণ মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার প্রয়োজন সেকালে অনুভূত হয়নি। পরবর্ত্তী কালে মেয়েদের অল্প বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় পাঠানো হ'ত। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা বাড়ীতেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ ক'রত। বর্ত্তমানেই প্রাথমিক স্তরে সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভাবা হ'চ্ছে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের পর্দ্দা-প্রথা অনেকাংশে কম।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হ'লে যে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, সেটা কম নয়। গ্রামের দিকে ছেলেদের একটা ও মেয়েদের একটা আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রসহ পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা

ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু একই স্কুলে যদি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে, তা হ'লে কম ব্যয় হবে। দুটো স্কুল থাকলে দুটোকেই সমানভাবে খরচ দেওয়া আমাদের মত দেশে সম্ভব নয়। তাই দু-একটা স্কুল পরিচালনায় যা সাধারণ খরচ তার থেকে কিছু বেশী খরচ দিয়ে ভাল স্কুল করা যায়। অতিরিক্ত অর্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। তাই প্রাথমিক স্তরে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে আদর্শ গৃহাঙ্গন। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে এসে ভবিষ্যতে যাতে সুস্থ স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন জীবন গ'ড়ে তুলতে পারে, সেটাই সহ-শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রাথমিক পর্য্যায়ে সহ-শিক্ষাতে শিক্ষকরা পুরুষ না হ'য়ে স্ত্রীলোক হবেন। আর বিশেষ ক'রে বিবাহিতারাই এ কাজের যোগ্য। কারণ জীবনে প্রথম শিশুর ঘর ছেড়ে বাইরে আসা। মায়ের প্রতিভূ একজনকে পেলেই তবে তাদের ঘর-ছাড়ার দুঃখ ঘোচে। মেয়েরা তাঁদের সহজাত কমনীয়তা দিয়ে শিশুর জীবন বুঝতে পারেন। আর সেলাই, হাতের কাজ, গান—এই সব বিষয় শিক্ষাদানে তাঁরা বেশী ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। আর এই সব স্কুলে শিক্ষিকা থাকলে মেয়েদের অভিভাবকরা আমাদের দেশে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে পাঠাবেন। বর্ত্তমানের শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার কৃচ্ছ্রতার দিনে হয়ত সমস্ত স্কুলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই যথাসম্ভব বিবাহিতা শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কাজ চালানো উচিত।

৫ থেকে ৯।১০ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি ওঠে না। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষাটা একটা চিন্তার ব্যাপার। কারণ মাধ্যমিক স্তরেই ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধি আসে। এই সময়ে মেয়েদের বৃদ্ধি ছেলেদের তুলনায় বেশী দ্রুত হয় কিন্তু ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী শক্তিমান হয়। তাই একই ধরণের কাজ তারা সমানভাবে ক'রতে পারে না। মনের বিবর্ত্তনও ছেলে ও মেয়েদের ভিন্নভাবে হয়। তাই ছেলেদের সমান মানসিক কাজও তারা ক'রতে পারে না।

সহ-শিক্ষার সমর্থকরা এটা জানেন যে, ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক ক্ষমতা এক নয়। তাঁদের মতে এটা সহ-শিক্ষার এমন বড় প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু এ

কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র ব্যায়াম ও খেলা-ধুলার ক্লাশেই এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। মেয়েদের ক্লান্তি ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি আসে। তাই ছেলেরা যতক্ষণ ধরে কাজ ক'রতে পারে, মেয়েরা ততক্ষণ ধরে কাজ ক'রতে পারে না।

মানসিক দিক থেকেও বিচার ক'রলে আমরা দেখি, ছেলেমেয়েদের প্রবণতা এক খাতে বয় না। সাধারণভাবে ছেলেরা অঙ্ক, শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ফল দেখায়। মেয়েরা তেমন সাহিত্য, কলা ইত্যাদিতে ভাল। সুতরাং প্রবণতা অনুযায়ী যদি শিক্ষা-ব্যবস্থা ক'রতে হয়, তবে একই ধরণের পাঠ্যক্রম দু'জনের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। ছেলেদের অনুসন্ধিৎসা, সৃজনধর্ম্মিতা, দুঃসাহসিকতা বেশী। মেয়েরা স্বভাবতঃ ভীরু, লাজুক। তবে এর অনেকখানি নির্ভর করে পরিবেশের ওপর।

মেয়েদের দায়িত্বজ্ঞান ছেলেদের তুলনায় বেশী। তাদের ধৈর্য্যও বেশী। কোন কঠিন কাজ মেয়েদের দিলে তারা নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সেই কাজ শেষ ক'রবে। কিন্তু ছেলেরা তা অবহেলায় ফেলে চ'লে যাবে। সহ-শিক্ষার সমর্থকরা বলেন যে, একই সঙ্গে পড়ার দরুণ ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে শিখবে দায়িত্বজ্ঞান, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি, আর মেয়েরা শিখবে স্বাধীন চিন্তা ক'রতে, আত্ম-বিশ্বাস রাখতে।

শুধুমাত্র বিষয়-বৈচিত্র্যটাই একটা বড় সমস্যা নয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি, ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ও ভাবতে হয়। শিক্ষাদান ক'রবেন শিক্ষক না শিক্ষিকা সেটাও একটা বড় সমস্যা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষদিকে ছেলে ও মেয়েরা পূর্ণতা পায়। তাদের মনজগতে তখন গভীর আলোড়ন দেখা যায়। সেই সময় তাদের পরস্পরের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক জন্মাতে পারে, এরকম আশঙ্কা অনেকেই ক'রে থাকেন। তবে এর বিপক্ষে বলা হয় যে, ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে একইভাবে মেশার ফলে তাদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। কেন না তাদের মধ্যে কোন বাধা থাকে না। প্রতিবন্ধকই অবৈধ সংসর্গের কারণ হ'তে পারে।.

নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক থেকে সহ-শিক্ষার সমর্থকরা বলেন যে, সহপাঠী মেয়েদের কমনীয়তা ছেলেদের উদ্ধত স্বভাবকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। ছেলেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, বেপরোয়া, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধন তারা মানতে চায় না। কিন্তু মেয়েদের সামনে শাস্তি পেয়ে আত্ম-সম্মান খোয়ানোর ভয়ে অন্যায় ক'রতে একটু ইতস্ততঃ করে। সহ-শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েরা বেশী মাত্রায় আত্মসচেতন হ'তে পারে না। তবে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন আসে, সেটা উভয় পক্ষের একান্ত নিজস্ব। দুটো স্বতন্ত্র ধারা বয়ে চলে। তাই ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ক'রলে ভাল ফল পাওয়া যায় না ব'লে অনেকে মনে করেন।

ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের শিক্ষা দেওয়াটা নির্ভর করে সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ওপর। সমাজে মেয়েদের যে স্থান, তার শিক্ষাও হয় সেইভাবে। সাধারণতন্ত্রী রাশিয়া নারী-পুরুষকে সমানাধিকার দিয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও রাষ্ট্রের কাছে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নেই। তাই তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাও সমান। আবার জার্ম্মাণীতে মেয়েদের শুধু গৃহকর্ত্রী আর সন্তানের জননী হিসাবেই দেখা হ'য়েছে। তাই তাদের পুরুষালি ধরণের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয়নি। গৃহ-জাবনের উপযোগী শিক্ষাই তাদের দেওয়া হ'য়েছে। তাই সেক্ষেত্রে সহ-শিক্ষার কথা ওঠেই না।

আমাদের দেশেও নারীকে গৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখাটাই ছিল ব্যবস্থা। তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোনদিনই অনুভূত হয়নি। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতীচ্যের নারীপ্রগতি এদেশীয় নারীপ্রগতির প্রেরণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাই পাশ্চাত্যের মত অত আধুনিকা না হ'লেও বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী আপন আসন প্রতিষ্ঠা ক'রেছে। শিক্ষাদান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আইন, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা আজ এগিয়ে গেছে। এদেশে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রচলন হয়নি।

আধুনিক যুগের জাপান, তুর্কীর মত প্রগতিশীল দেশেও বয়ঃসন্ধিকালে সহ-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন নেই। তাদের আদর্শ মেয়েদের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ

যা ক'রে গ'ড়ে তোলা। তাদের সাহায্যেই দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন আনতে হবে।

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা কতদূর কার্য্যকরী হবে, সেটা একটা ভাববার বিষয়। ভারতীয় আদর্শে নারী প্রথমে গৃহলক্ষ্মী, যার কল্যাণ-স্পর্শে প্রতিটি গৃহ মঙ্গলময় হ'য়ে উঠতে পারে। সমাজের সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ তাতেই হবে। তাই ব'লে সে অশিক্ষিত, মূর্খ ও সংস্কারাচ্ছন্ন হবে না। কারণ হিন্দু সভ্যতার ধারিকা ও বাহিকা হিসাবেও তার কর্ত্তব্য আছে। তাই শিক্ষা তার পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রত্যেক শিক্ষিত পিতামাতাই আজকাল চান তাঁর ছেলে বা মেয়েরা যেন কার্য্যকরী শিক্ষা পায়, যাতে ভবিষ্যতে তাদের পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে না থাকতে হয়। মেয়েদের শিক্ষা তাই শুধু বাইরের জগতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঘরের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী শিক্ষাও তার পাওয়া চাই। আমাদের দেশে অতি আধুনিক পরিবারের পিতামাতারাও মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষার পক্ষপাতী নন।

ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য যথেষ্ট, তাদের জীবনের ক্ষেত্রও ভিন্ন; তাই মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা কতদূর কার্য্যকরী হবে সেটা ভাবতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের ও মেধার শিক্ষার্থীদের সমাবেশ হয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মোটামুটি স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলিতে অধিকার অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। কিন্তু যে সব বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত উন্নত, সেখানে শিক্ষার্থীদের দেহের অবস্থা, মনের ক্ষমতা ও সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা চিন্তা ক'রে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। কারণ শিক্ষার্থীদের জীবনের এই সব দিকের উন্নতি ও অবনতি তাদের শিক্ষার কাজকে অনেক এগিয়ে ও পেছিয়ে দেয়। আদর্শ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সকলেরই উদ্দেশ্য—আদর্শ ও স্বার্থ একই হ'তে হবে। সেখানে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়। কারণ সমগোত্রীয় হবার ফলে পরস্পরের সহযোগিতা তারা লাভ করে।

বিদ্যালয়-সৃষ্টির গোড়ার দিকে দেখা যায়, একজন শিক্ষক ছোট একদল ছাত্র নিয়ে বসতেন। শিক্ষার্থীরা এক-একজন ক'রে শিক্ষকের কাছে গিয়ে তাদের পড়া দিত আর অন্যেরা সেই সময় পড়া তৈরি ক'রত। এর ফলে প্রত্যেক ছাত্রই শিক্ষকের সাহচর্য্য অল্প সময়ের জন্যও পেত। ক্রমে যখন ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায় তখন শিক্ষকরা মনিটরের সাহায্যে পড়াতেন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষক নিজে পড়িয়ে তাদের দিয়েই অন্য ছাত্রদের পড়াতেন। জন-সাধারণের মনে শিক্ষার সম্পর্কে যখন চেতনা জাগল, তখন এই মনিটর প্রথার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমলো।

এর পর থেকে আরম্ভ হ'ল শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের শ্রেণী-বিন্যাসের। এক এক শ্রেণীর ভার এক-একজন শিক্ষকের হাতে রাখা হ'ল। এই প্রথায় যদিও এককভাবে ছাত্ররা শিক্ষকের সাহচর্য্য পেত না কিন্তু সময়, শক্তি ও অর্থের যথেষ্ট সাশ্রয় হ'ল। কারণ আগের তুলনায় অনেক বেশী ছাত্র অল্প অর্থে একই সময়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেল। এই যৌথ শিক্ষালাভের ফলে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষালাভ ক'রল। সহপাঠীদের সঙ্গে

কাজের তুলনা ক'রে ছাত্ররা নিজেদের উৎকর্ষ, অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে। প্রতিযোগিতার ফলে ছাত্রদের কাজে উৎসাহ ও উত্তম বাড়ে। শ্রেণী শিক্ষার কতকগুলো দোষও আছে। প্রথমতঃ শিক্ষক সাধারণভাবে সকলকে উদ্দেশ্য ক'রে তাঁর পাঠ দেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, কোন ছাত্রের সঙ্গেই কোন ছাত্রের মিল নেই। প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধি, মেধা, রুচি, প্রকৃতি ভিন্ন। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠদান সকলকে সমানভাবে স্পর্শ করতে পারে না। মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে চ'লতে হয় ব'লে তারা তাদের ক্ষমতানুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে না। শিক্ষক যদি এদের দিকে মনোযোগ দেন, তা হ'লে বাকী সকলের এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা সকলে সমান কাজ পায় না। ফলে শিক্ষকের প্রচেষ্টার খানিকটা অপচয় হয়। কারণ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এক নয়। বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যকে একটা বড় স্থান দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিক্ষার ভিত্তিভূমি হবে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের ওপর। প্রত্যেক ছাত্রের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক গঠন এক নয়। তাই শ্রেণীতে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষাদান ক'রবার সময় সকলের মান একই ধরার ফলে পাঠের অসম বণ্টন হয়। এই ধরণের শিক্ষার খরচের আধিক্য একটা চিন্তার ব্যাপার। আমাদের একটা মধ্য পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। যে পন্থায় আমাদের সনাতন শ্রেণী-পাঠনের রীতিও বজায় থাকে অথচ ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়।

সমবেত পাঠনে এই ত্রুটি দূর ক'রতে হ'লে প্রথমে দেখতে হবে শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ। কারণ ছাত্রসংখ্যা যদি কম হয়, তবেই শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে খোঁজ রাখা সম্ভব হয়। ছাত্রসংখ্যা নির্ভর করে বহু বিষয়ের ওপর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা একই ধরণের হবে না। শিক্ষকের পরিচালনা ও পাঠদানের ক্ষমতা, শ্রেণীর বিশেষ উদ্দেশ্য, শ্রেণীর অবস্থান ও বিদ্যালয় অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রসংখ্যা অন্যান্যদের

তুলনায় কম হবে। কারণ এ সময়ে শিশুচিত্ত থাকে বিকাশোন্মুখ। এ সময়ে ছাত্রদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা-বোধ থাকে না। তাই তাদের পরিচালনাও একটা সমস্যার ব্যাপার। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সমস্যাটা এত প্রবল থাকে না। তবে অনেকে বলেন যে, প্রাথমিকোত্তর সমস্ত রকমের শিক্ষায় ছাত্রদের নিজেদের লেখার ও পরীক্ষামূলক কাজ বেশী থাকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রত্যেকের কাজ দেখার প্রয়োজন। সুতরাং সেখানে ছাত্রসংখ্যা বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমানের উত্তরোত্তর শিক্ষা-প্রসারের প্রচেষ্টায় বহু জায়গাতেই ছাত্রসংখ্যা শ্রেণীতে বেড়েই চ'লেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, একজন শিক্ষকের অধীনে ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাধিক ৩০ হওয়া উচিত। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কথাটা খুবই চিন্তার। আজকের দিনে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে। তাই ২৫ বা ৩০ যেটাই আদর্শ মনে করা যাক না কেন, সেটাকে গ্রহণ করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপনার ক্ষমতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা, অন্তর্দৃষ্টির সম্পর্ক গভীর। কারণ যে সব শিক্ষকের এই সব গুণ বেশী পরিমাণে থাকে, তাঁদের পক্ষে ছাত্রসংখ্যা কিছু বেশী হ'লে আসে-যায় না। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকের এ সব গুণের অভাব, তাঁদের পক্ষে ছাত্রসংখ্যা বেশী হ'লে মুস্কিল হয়। এ সব গুণ অর্জ্জনের গুণ নয়। অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতের এ সব গুণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না, আবার অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তির বহুল পরিমাণে থাকে।

নাচ, গান, বাজনা, ব্যায়াম, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা, ইতিহাসের কতকগুলি অংশ, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে একসঙ্গে বহুজনকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে সাপ সম্বন্ধে যদি পাঠদানের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে ২।৩টি শ্রেণীকে একত্র ক'রে শেখানো যেতে পারে। কারণ এই ধরণের বিষয়গুলো সকলেই ভালভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে। তাই ভাল ভাল স্কুলে ম্যাজিক লণ্ঠন, সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে এক্ষেত্রে যে শিক্ষক এ ধরণের পাঠ দেন, তাঁর বিশেষ পরিশ্রম হয়। সুতরাং এরকম পাঠদানের ব্যবস্থা ঘন ঘন করা উচিত নয়।

শ্রেণী-কক্ষের আয়তনও একটা বিবেচ্য বিষয়। কারণ যে কয়জনের জন্ম শ্রেণী-কক্ষের ব্যবস্থা আছে, তার বেশী ছাত্র হ'লে ছাত্রদের শৃঙ্খলা-রক্ষাতেও অসুবিধা, আবার ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানিও অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় দেখা যায় যে, বৎসরারম্ভে যত ছাত্র ভর্ত্তি হয় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত থাকে না। সেইজন্ম কিছু বেশী ছাত্র শ্রেণীতে নেওয়া যেতে পারে। শ্রেণী-কক্ষের আয়তন পরিকল্পনার সময়েই যত জনের প্রয়োজন, তার চেয়ে ১০ জনের বেশীর আয়োজন রাখা উচিত।

শ্রেণীতে ছাত্রদের জ্ঞানদানই শিক্ষকের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়, ছাত্রদের জ্ঞানদানে উৎসাহী করা এবং জ্ঞানার্জ্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাঁদের কর্ত্তব্য। সেই কারণে শ্রেণীতে একজাতীয় ছাত্র থাকা উচিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রতিটি বিষয় শিক্ষার একটা ক্রম থাকে। কিন্তু একইভাবে প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্ম ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা সমান কাজ করে না। প্রত্যেক ছাত্রকে যদি সম্পূর্ণ আলাদা-ভাবে নিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হ'লেও সে সমস্ত বিষয় সমানভাবে শিখতে পারে না। কোন ছাত্র হয়ত অঙ্ক ভালবাসে, ইতিহাস ভালবাসে না। অঙ্ক আর ইতিহাসে একই সময় দেওয়া সত্ত্বেও অঙ্কের অগ্রগতি বেশী হয়। বছরের প্রথমে যখন ছাত্র ভর্ত্তি হয়, তখন সাধারণতঃ একই মানের ছাত্রদের একই শ্রেণীতে নেওয়া হয়। কিন্তু শেষের দিকে দেখা যায় যে, কয়েকজন ছাত্র বেশ এগিয়ে গেছে, আর কয়েকজন ছাত্র সে তুলনায় এগোতে পারেনি। সেজন্ম সমজাতীয় ছাত্র নির্ব্বাচনের সময় শুধু তারা কতখানি জ্ঞান অর্জ্জন ক'রেছে তা দেখলেই চ'লবে না, কতটা সময়ে কতখানি শিখতে পারে, তা-ও দেখতে হবে। ছাত্রদের শ্রেণী-বিভাগ এমনভাবে ক'রতে হবে যাতে সব থেকে অল্প সময়ে সব থেকে বেশী লিখতে পারে। শ্রেণী-বিভাগের সময়ে শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্ক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে হবে। ছাত্রদের স্বভাব, সংখ্যা, বিষয়, সময়—এ চারটি জিনিস মনে রেখে শ্রেণী-বিভাগ ক'রতে হবে।

বছরের প্রথমে হয়ত একজাতীয় ছাত্রদের নিয়ে শ্রেণী আরম্ভ করা হ'ল। কিন্তু সেই বছরের মধ্যে আরও অনেক ছাত্র বিভিন্ন সময়ে ভর্ত্তি হ'ল। এতে

যারা পরে ভর্ত্তি হ'ল তারা অনেক বিষয়েই পিছিয়ে রইল। এক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রদের মধ্যে সমতা বজায় থাকে না। আমাদের দেশে এটা খুব বেশীই হয়। কারণ অধিকাংশ অভিভাবকই স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান ও বছরের যে-কোন সময়ে কোন রকমে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেন। নীচু ক্লাশেই এটা বেশী হ'য়ে থাকে। স্কুল সেসনের মধ্যে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাওয়াটা বন্ধ করা দরকার। এতে ছাত্রেরও ক্ষতি হয় এবং শ্রেণীরও ক্ষতি হয়।

বড় বড় স্কুলে বেশী ছাত্রদের ভাল, মাঝারি, খারাপ—এই তিন ভাগে ভাগ ক'রে একই শ্রেণীর বিভিন্ন শাখা করা চলে। কিন্তু ছোট স্কুলে অল্প ছাত্রদের মধ্যে এরা সকলে মিলে থাকে, ফলে শাখায় ভাগ করা যায় না। তাই তাদের একসঙ্গেই থাকতে হয়। এর প্রধান কারণ ছোট স্কুলের পক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না।

শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি :

যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সে সব দেশে ছাত্রদের বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই একসঙ্গে একই বয়সের ছেলে থাকার দরুণ একই ধরণের শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু সব সময় একই বয়সের ছেলেরা একই রকমের হয় না। অনেক ১২ বছর বয়সের ছেলে আছে যাদের বুদ্ধি ৬ বছর বয়সের মত। মনোবিজ্ঞানীরা এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের বয়সের চেয়ে তাদের মানসিক ক্ষমতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেন। ক্লাশে যে সব বয়স্ক ছেলে থাকে তাদের সাধারণতঃ অন্যদের থেকে নিষ্ঠা কমই থাকে। তারা পড়াশুনায় ভাল ফল দেখাতে পারে না; তাই তারা শিক্ষকদের অবহেলার পাত্র হ'য়ে থাকে। ফলে তারা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে নানা রকম অপকর্ম্ম ক'রে নিজেদের জাহির ক'রতে চায়। তারা অন্য ছাত্রদের সামনে কু-আদর্শ হ'য়ে থাকে। এরা সাধারণতঃ ক্লাশে উঠতে পারে না, আর একই ক্লাশে একাধিক বছর পড়ে থাকে; তাই তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অভিভাবকদের পক্ষে খরচ চালানো মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। এর ফলে

অর্থ, সময় ও শিক্ষার অনর্থক অপচয় ঘটে থাকে। এই অপচয় বন্ধ ক'রতে হ'লে হয় তাদের উঁচু ক্লাশে উঠিয়ে দিতে হবে বা তাদের স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হবে। উঁচু ক্লাশে উঠিয়ে দিলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজের যোগ্যতা বাড়াবার দায়িত্ব বাড়ে।

আজকাল মানসিক বয়স বিচার ক'রে ছাত্র ভর্ত্তির ব্যবস্থা হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে এ ব্যবস্থা বিশেষ ফলদায়ক। অনেক সময় অনেক ছাত্র অস্বাস্থ্যকর, অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়। আসলে এরা যে কিছুই জানে না তা নয়।

মানসিক ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা করা হবে, তা একমাত্র বিশেষজ্ঞ শিক্ষকই ক'রবেন। ছাত্ররা নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করার সুযোগ পাবে না। শুধু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাই নয়, উচ্চতর ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়গুলির জ্ঞানের পরিমাপেরও প্রয়োজন। কারণ তা না হ'লে কোন বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে-পড়া ছেলে ক্লাশের পড়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ পাবে না। নীচু ক্লাশে ছাত্রদের শেখবার ক্ষমতার পরিমাপের প্রয়োজন, কিন্তু উঁচু ক্লাশে কতখানি শিখতে পারে ও কতটা শিখেছে—দুই-এর পরিমাপ সমান প্রয়োজনীয়।

সাধারণতঃ এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ওঠবার সময় প্রধান বিষয়-গুলিতে কৃতকার্য্য হ'লেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অপ্রধান বিষয়গুলিতে অকৃতকার্য্য হ'লেও বিশেষ আসে-যায় না। চিরাচরিত প্রথা এটাই। পরীক্ষার আধুনিক বিশেষ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ ক'রলে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের নির্ভুল মান নির্ণয় করা সহজ হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া, লেখা, সহজ অঙ্ক প্রভৃতিতে এই নূতন পদ্ধতি প্রযুক্ত হ'তে পারে।

প্রকৃত বয়স নির্দ্ধারণ শ্রেণী-বিভাগের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এই বয়স দিয়েই আর প্রত্যেকের social maturity-র পরিমাপ হ'তে পারে। আমেরিকার Winnetka স্কুলগুলোতে ছাত্রদের সামাজিক বিকাশ (social development), শারীরিক বিকাশ, নৈতিক ও মানসিক

ক্ষমতা, উচ্চাশা, আগ্রহ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগের মূল সূত্রের সবগুলি যদি মেনে চ'লতে হয়, তবে শ্রেণী-পাঠনই পরিত্যাগ ক'রতে হবে। কারণ এর ফলে শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা এত বেশী রকম কমে যাবে যার ফলে শ্রেণী-পাঠনের প্রয়োজন হবে না। সেইজন্ত আমাদের প্রথমে ধ'রতে হবে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের মান ও গ্রহণের ক্ষমতা। এর পরে কতখানি সে সেই সময় পর্য্যন্ত সংরক্ষণ ক'রেছে তার পরিমাপ। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের বিশেষ বিষয়ে দক্ষতার অনুসন্ধানের জন্ত কতকগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও প্রয়োজন। কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। আধুনিক যুগের নানাধরণের বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুরূপ অভীক্ষার সাহায্যে শ্রেণী-বিন্সাস অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

যদিও শ্রেণীতে ছাত্র ভর্ত্তির সময় একই ধরণের ধীসম্পন্ন ছাত্রদের একই শ্রেণীতে নেওয়া হয়, তবুও শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে মেধার প্রভেদ দেখা যায়। ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতাটা বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিকভাবে বাড়ে বা কমে। পাঁচ বছরের একটা ছেলের মানসিক শক্তি যদি ৪ বছর বয়সের মত হয়, তবে ১০ বছর তার যখন বয়স হবে তখন তার মানসিক বয়স হবে ৮ বছর অর্থাৎ ২ বছর কম। শৈশবে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা হিসাবে ভাগ না ক'রলেও চলে কিন্তু মাধ্যমিক বিস্তালয়ে ছাত্রদের রুচি, প্রকৃতি ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ করার প্রয়োজন হয়।

সমজাতীয় ছেলেদের নিয়ে শ্রেণী গঠন ক'রলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। তাই মন্টেসরি পদ্ধতিতে সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের প্রচলন নেই। এতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

শ্রেণী-বিভাগ ক'রেও তার মধ্যে মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্রদের ভাগ করা যায়। এতে ফল ভালই হয়। একই শ্রেণীতে যদি ছাত্রদের ভাল, মাঝারি ও মন্দ—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেই রকমভাবে তাদের তিন দলকে শিক্ষা দেওয়া যায় তা হ'লে সকলের প্রয়োজনই মেটে। আর প্রতি শাখার ছাত্ররা চেষ্টা ক'রে উচ্চতর শাখায় যেতে পারে। অনেকে বলেন যে, এতে ভাল ছাত্র না থাকার দরুণ মাঝারি ও মন্দ শাখার ছাত্ররা

বিশেষ উৎসাহ অনুভব ক'রে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় পিছিয়ে-পড়া ছাত্ররা ভাল ছাত্রদের সম্পর্কে বেশী উৎসাহী হয় না। কারণ তারা যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারবে না সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত থাকে। অনেকের মতে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের একটা আলাদা শাখায় ভাগ করা কর্ত্তব্য। আর তারা সংখ্যায় যত কম হবে কাজ ততই ভাল হবে।

আর এক ধরণের পদ্ধতি আমেরিকায় প্রচলিত। এতে একটা নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম যথাক্রমে ৬, ৫ ও ৪ বছরে শেষ করা যায়। যারা ভাল তারা সেটা ৪ বছরে শেষ করে, যারা নিকৃষ্ট তারা ৬ বছরে করে। এর ফলে ভাল ছেলেরা নিজেদের শক্তিমত সময় বাঁচাতে পারে, আর মন্দরা ভালদের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে পিছিয়ে না প'ড়ে নিজেদের শক্তিমত এগিয়ে যেতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পরীক্ষা-পদ্ধতিকে আমরা মোটামুটিভাবে লিখিত, মৌখিক ও কার্য্যিক (practical)—এই তিন ভাগে ভাগ ক'রতে পারি। প্রথম ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এতে নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমানে তিন রকমের লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথম রকমে প্রবন্ধাকারে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। দ্বিতীয় রকমে বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীনভাবে বা কারুর কর্ত্তৃত্বাধীনে থেকে গবেষণা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা। তৃতীয় রকম আধুনিক যুগের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা objective test. এতে পরীক্ষার্থীদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংক্ষেপে 'হ্যাঁ', 'না' বা তলায় দাগ দিয়ে বহু ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অর্জ্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক বিচার।

মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিচারে লিখিত পরীক্ষার থেকে বেশী কার্য্যকরী। পরীক্ষকরা ছাত্রদের সামনাসামনি পেয়ে বুঝতে পারেন তারা কতখানি জানে, আর কতখানি তাদের অজানা। প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয় ব'লে তাতে সময় ও শক্তির দুই-ই বেশী ব্যয়িত করা হয়।

কার্য্যিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ ক'রে পরীক্ষকের সামনে দেখাতে হয়। যেমন ভূগোলে ব্যারোমিটার পড়ে দেওয়া, মাটির কাজে কোনো কিছু তৈরি ক'রে দেখানো ইত্যাদি।

দলগত (Group), ব্যক্তিগত (Individual), কার্য্যিক (Performance) ইত্যাদি নানা ধরণের পরীক্ষা আছে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা যেমন একদিকে সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ ক'রতে পারি, তেমনি পারি অর্জ্জিত জ্ঞানের।

পরীক্ষার পদ্ধতিকে Internal ও External এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। Internal পরীক্ষাতে পাঠক্রম-পদ্ধতি ও পরীক্ষক সবই পরিচিত। কিন্তু External-এ এ সবই থাকে অপরিচিত। বাইরের পরীক্ষায় স্বীকৃতি না পেলে বাইরের জগতে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ঘরোয়া পরীক্ষাটা বাইরের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য ঃ

External পরীক্ষার উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ। এই ধরণের পরীক্ষাতে একটা মান থাকে। এই মানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলে। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কতকগুলি ক্রম আছে। শিক্ষার্থীরা আশানুরূপভাবে সেই ক্রমগুলি অতিক্রম ক'রেছে কিনা সেটা পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় ত্যাগের আগে একটা পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই পরীক্ষায় স্কুলে স্কুলে, জেলায় জেলায় ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়। এর ফলে তাদের পারস্পরিক উৎকর্ষের বিচার করা যায়।

পরীক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করে না, তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। তাই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা কিছুদিন আগেও প্রবেশিকা নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই পরীক্ষার সাফল্য উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দিত।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেধাবীদের বেছে নিতে পারা যায়। ফলে দায়িত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনে সুবিধা হয়।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে স্কুলের কাজ ও শিক্ষকদের অধ্যাপনারও উৎকর্ষ-অপকর্ষের আভাস পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয় না।

পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি ঃ

আমাদের বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যয়ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'য়েছে। এখন পড়াটাকে তারা পরীক্ষায় ভাল করা বা পাস করার উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছে। ফলে পরীক্ষার

আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জনে ফাঁক থেকে যায়। External পরীক্ষাগুলোতে সাধারণতঃ পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রে ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকেন। এইজন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের ঠিক তেমনি ক'রে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তাই স্কুলের প্রস্তুতি (Test) পরীক্ষার পরের সময়টা ছাত্রদের কাটে পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেঁটে। ছাত্ররা শুধু মুখস্থই ক'রতে শেখে। আর সেই মুখস্থ বিদ্যার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়, কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ পর্য্যন্ত। এর ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কাজ ক'রতে ছাত্ররা শেখে না, সুবিচার ও যুক্তি-প্রয়োগের ক্ষমতা এবং উচ্চাদর্শ গ'ড়ে ওঠে না। তাই এই ধরণের পরীক্ষায় শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যারই পরীক্ষা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার পরীক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সুন্দরের অনুভব-ক্ষমতা দেয়। এই সব বিষয়গুলোর পরিমাপ বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় না। পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ক্ষমতার পরিমাপ পরীক্ষকরা ক'রতে পারছেন না। তাই আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাফল্য অর্জ্জন ক'রেছে। আবার শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত। বিচার হয় এখানে একটিমাত্র চরম পরীক্ষার সাহায্যে। সে পরীক্ষায় বহু ছাত্র নানা কারণে ব্যর্থ হ'তে পারে।

প্রশ্নের প্রস্তুতিতেও গোলযোগ থাকে। কারণ প্রশ্নগুলি যে ধরণের হয়, তাতে পরীক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। সমস্ত বিষয়ের ওপর ভাসা ভাসা প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের দু-চারটে নমুনা সংগ্রহ না ক'রে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ ক'রতে হয়, তা হ'লে তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই দৈবের হাতে গিয়ে পড়েছে। কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন করা হয়, তখন বেশীর ভাগ অধ্যায়ই বাদ পড়ে যায়। তাই অনেকে সমস্ত বই খুব ভাল ক'রে পড়ে যে ফল পায়, আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি নির্ব্বাচিত প্রশ্ন পড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্ব্বাচন

পরীক্ষকের নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়, তাদের আর পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয় না। কিন্তু উল্টোটা যে ক্ষেত্রে হয় তার ফল সহজেই অনুমেয়। প্রশ্নগুলি অনেক সময় এমনভাবে তৈরি করা হয়, যে সমস্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত সে সমস্ত বিষয়গুলো বাদ পড়ে যায়। আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলি হয় দুর্বোধ্য নয় দ্ব্যর্থবোধক। ফলে পরীক্ষক যে উত্তরটা চান সেটা অনেক পরীক্ষার্থী ধরতেই পারে না।

বর্ত্তমান পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে। এতে অনেক ভাল ছাত্রও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাল ক'রে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কারণ পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জানা জিনিসও ভুল করে, কোনো প্রশ্ন নির্ব্বাচন ঠিকভাবে ক'রতে পারে না। আবার অতি সাধারণ ছেলে মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাল ফল করে। প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ভাল ক'রে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকা চাই। অনেকে সব জিনিস লিখেও ভাল ক'রে গুছিয়ে না লেখার দরুণ ভাল ফল করে না। আবার অনেকে ভাষার চটক দিয়ে উত্তরকে এমনভাবে সাজায় যে সমস্ত বিষয় না লিখেও ভাল ফল করে, কারণ শেষোক্ত দল পরীক্ষকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়।

পরীক্ষকরা নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হ'তে পারেন না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন, আবার কেউ বা কঠোরতার ধার ধারেন না। আবার এক-একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন, আবার কেউবা বিস্তৃত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকদের প্রকৃতি জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের যুক্তি, বিষয়কে ভালভাবে সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার দখল, বানান, হাতের লেখা প্রভৃতির জ্ঞানও প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক নয়। তাই নম্বরও সকলে এক দিতে পারেন না। ফলে একই পরীক্ষার্থী একজনের কাছে কোন রকমে পাস করে ও অন্যজনের কাছে ভাল নম্বর পায়।

পরীক্ষা ছাত্রদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। এর প্রভাব ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর খুব স্পষ্ট। ফলে পরীক্ষার ওপর ছাত্রদের একটা বিরাগ জন্মায়।

বর্ত্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এখানে পরীক্ষাটা একটা ছাড়পত্র। যে ভাল ফল করে, সে এই ছাড়পত্র নিয়ে যায় সরকারী চাকরির দরবারে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। এইটুকুর জন্যই যেন পরীক্ষার দরকার। পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা আমাদের দেশে সুস্পষ্ট নয়।

পরীক্ষার প্রয়োজন :

পরীক্ষার বিপক্ষে যত কথাই বলা যাক না কেন, পরীক্ষাকে যে নির্মূল করা যায় না এ বিষয়ে সকলেই একমত। পরীক্ষা শিক্ষাজগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের কথা। শিক্ষকদের কাজ কতখানি সাফল্য লাভ ক'রেছে বা পরীক্ষার্থীরা কতখানি জ্ঞান লাভ ক'রেছে, তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার ফলে শিক্ষকরাও জানতে পারেন কোন্ ছাত্রের গ্রহণের ক্ষমতা কতখানি, উচ্চতর শ্রেণীতে স্থান পাবার অধিকার কার আছে কার নেই। অভিভাবকরাও জানতে পারেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি কেমন হ'চ্ছে। তারা যে বিষয়ে কাঁচা সে বিষয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা ক'রতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও নিজেদের সম্বন্ধে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগে সুবিধা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-নির্ব্বাচনও সহজ হয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তুলনা করা যায়।

পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই সময়ের পরীক্ষার্থীর ক্ষমতার পরিমাপ করে না, তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির আভাস দেয়। এর সাহায্যে তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম ঠিক করা যায়। প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা থাকে। পরীক্ষার সাহায্যে আমরা সেই ক্ষমতা খুঁজে বার ক'রতে পারি।

পরীক্ষা যদি না থাকত তা হ'লে শিক্ষার্থীদের কাজের তাগিদ থাকত না, নিয়মনিষ্ঠভাবে কোন কিছুই তারা শিক্ষা ক'রত না। পরীক্ষা যদিও তাদের

সব সময় স্বেচ্ছায় কাজে প্রণোদিত করে না, তবুও সাময়িকভাবে তাদের কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পরীক্ষার জন্য ছাত্ররা অধীত বিষয় নূতন ক'রে অভ্যাস করে। ফলে পুনরনুশীলনে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দৃঢ় হয়।

পরীক্ষা ছাত্রদের বিষয়ের সামগ্রিক বিচারে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানকে যুক্তিনিষ্ঠ ক'রতে সাহায্য করে।

শিক্ষণের ত্রুটি এবং পাঠক্রমের ত্রুটি নির্ণয় ক'রতে পারে এই পরীক্ষা। এর ফলে শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতি সংশোধন ক'রে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ ক'রতে পারেন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন ক'রতে পারেন, উন্নততর শিক্ষা-প্রণালী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতে পারেন এবং মোট কথা শিক্ষানীতির সংস্কার ক'রতে পারেন।

পরীক্ষার সংস্কার :

পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ক'রতে হ'লে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় পরীক্ষকদের ওপরে। পরীক্ষক হবার যোগ্যতা সকলের থাকে না, তাই সুপরীক্ষক-নির্ব্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষক হবেন তাঁর সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান তো থাকবেই, উপরন্তু অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও থাকবে। কারণ পরীক্ষকের যদি পাঠক্রম ভালভাবে না জানা থাকে, অধ্যয়নের পদ্ধতি না জানা থাকে, তা হ'লে পরীক্ষার্থীদের ওপর তিনি সুবিচার ক'রতে পারবেন না। পরীক্ষকরা ছাত্রদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন। পরীক্ষার্থীদের পরিবেশও তাঁদের চিন্তা ক'রতে হবে। শহরের ছেলেকে ধানচাষের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা ক'রলে সে পারবে না, কিন্তু গ্রামের ছেলে সহজেই পারবে। পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে ধারণা শিক্ষকমাত্রেরই থাকে। তাই তাঁরা উঁচুদরের প্রশ্ন ক'রে পরীক্ষার্থীদের বিব্রত ক'রবেন না।

পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষক অনেককে একটু বেশী পছন্দ করেন, আবার অনেককে করেন না। পরীক্ষকরা এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব সংস্কার থেকে মুক্ত হবেন।

লিখিত পরীক্ষায় অনেকে ভাল ফল ক'রতে পারেন না। সেজন্য লিখিতের সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ফল ভাল হয়। মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রদের সপ্রতিভতা, ভাল ক'রে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা প্রভৃতি ধরা পড়ে।

স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে কাজের একটা মূল্য আছে। পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণের আগে এগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার। কেননা স্কুলের কাজ থেকে কার ক্ষমতা কতখানি এবং যোগ্যতা যে কতখানি, তার কিছুটা জানা যায়। স্কুলের ভাল ছেলে হঠাৎ চরম পরীক্ষায় কোন কারণে অকৃতকার্য্য হ'ল। এতে তার পরীক্ষাটা ঠিক হ'ল না, বা খারাপ ছেলে হঠাৎ ভাল ক'রল, এটা তার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের ছাত্রদের রেকর্ড রাখা উচিত। তবে এই রেকর্ডে উল্লিখিত নম্বরগুলো যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের সময় একথা ভাল ক'রে মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের চিন্তার অবকাশ থাকবে। বই খুলে সামনে ধরে দিলেও পরীক্ষার্থীরা যাতে চিন্তা না ক'রে উত্তর দিতে না পারে। ফলে ছাত্ররা মুখস্থ করার সুযোগ পাবে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পরিমাপই নয়, পরীক্ষার্থী নিজে কতখানি চিন্তা ক'রতে পারে তা-ও। প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট, রহস্যমুক্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত হবে। প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার পদ্ধতিটা ধরা পড়বে। এর ফলে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পদ্ধতিকে সংশোধন ক'রতে পারে। ছাত্ররা যাতে ভাগ্যের দোহাই না দিতে পারে, সেজন্য বাছা বাছা প্রশ্ন না ক'রে সমস্ত বিষয়ের উপর ছড়িয়ে প্রশ্ন ক'রতে হবে। এতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন-চয়ন সহজ হবে। প্রশ্নগুলির মান সমান রাখতে হবে।

নম্বর দেবার সময় পরীক্ষকদের যে নিরপেক্ষ হ'তে হবে, একথা আগেই বলা হ'য়েছে। যেখানে একাধিক পরীক্ষক একই ধরণের উত্তর-পত্র পরীক্ষা করেন, সেখানে পরীক্ষকদের সম্মিলিতভাবে কয়েকটা নীতি নির্দ্ধারণ করা উচিত। তা হ'লে নম্বর দেওয়া অনেকটা একই ধরণের হবে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর না দিয়ে A, B, C, D, E—এইভাবে কাজ অনুসারে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া

যায়। এতে একদিক থেকে সুবিধা হ'লেও প্রত্যেক ছাত্রের ফল ক্রম অনুসারে সাজানো ও মানপত্র ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা হয়।

আমাদের সনাতন পদ্ধতি কিছু সংস্কার ক'রে তার সঙ্গে যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাগুলো চালানো যায়, তা হ'লে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল ক'রতে পারেনি বা যাদের স্কুল রেকর্ড ভাল নয়, তাদের পক্ষে এই ধরণের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ ব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য দেশে আছে। যেমন কলম্বিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও স্কুল রেকর্ড ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল বিচার ক'রে ছাত্র ভর্তি করা হয়।

শুধুমাত্র সনাতন পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রস্তুত ও পরীক্ষা গ্রহণ না ক'রে নূতন ধরণের প্রশ্ন প্রস্তুত ও বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ ক'রতে হবে। কেননা আধুনিক Scholastic Testগুলোকে একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে নেওয়া যায় না। Intelligence Test পরীক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাপক। Scholastic Test দিয়ে স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান মাপা যায়। External পরীক্ষায় চিরন্তন পদ্ধতির সঙ্গে এ দুটো রাখতে পারলে ফল ভাল হয়। তবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যদি সংস্কার ক'রতে হয়, তা হ'লে এই দুই পদ্ধতিই অপরিহার্য্য।

পরীক্ষা গ্রহণ এমনভাবে করা হবে যেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার চাপ বুঝতে না পারে। কারণ বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে এর চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্লান্ত দেহে যখন এরাই জীবনের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন অবসন্ন দেহমনের খুব কম শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। তাই সেখানে সাফল্যলাভ করা আর তাদের ভাগ্যে ঘটে না। সেইজন্য external পরীক্ষার সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। আমাদের দেশে আগে নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এসব ব্যবস্থা এখন বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর বদলে যদি পরিদর্শকের ও প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা মাঝে মাঝে নেওয়া যায়,

তবে ফল ভাল হ'তে পারে। এই পরীক্ষার ফলের উপর মানপত্র দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের পরিদর্শকরা জানতে পারবেন কোন্ কোন্ ছাত্র বয়স অনুপাতে বেশী এগিয়েছে বা পেছিয়ে পড়েছে, এতে ছাত্রদের মান নিরূপণও সহজ হবে। এই সব পরীক্ষাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত সমস্যা। বেশ কিছুকাল ধ'রে কি ক'রে এর সংস্কার সাধন করা যায়, সেদিকে শিক্ষা-ব্রতীদের দৃষ্টি পড়েছে। বর্ত্তমানে Objective Testগুলি পরীক্ষা-পদ্ধতিতে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের Intelligence ও Standardised Testগুলি পরীক্ষার নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ক'রেছে। পুরাতন ধরণের প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণে নানা দোষ থাকলেও সম্পূর্ণভাবে কেউ একে বর্জ্জন করেননি। বরং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে ব'লে অনেকে এর পক্ষে রায় দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চাইছে। ছাত্রদের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিমাপের পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্কুলে নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সেইজন্য শিক্ষকরা হবেন বিশেষ শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রাপ্ত। External পরীক্ষার যে সব ত্রুটি আছে তা স্থির ক'রতে হবে। কারণ অনেকের মতে বাইরের পরীক্ষকের চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিলে ফল ভাল হয়। তাঁরা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Tests):

প্রত্যেক শিক্ষাই উদ্দেশ্যমূলক সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ত্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আমরা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। এই ত্রুটি সংশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র এর অবসান ঘটে, ততই আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে আমাদের যাচাই ক'রতে হবে। কিভাবে আমরা মান নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রব, এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার আবার তিনটি দিক উল্লেখযোগ্য ; যথা,

(ক) **সত্যনিরূপণ ক্ষমতা** (Validity) ;

(খ) **নির্ভরতা** (Reliability) ;

(গ) **ব্যবহারিকতা** (Usability)।

এর সবগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তার নাম দেওয়া যেতে পারে **মান-নির্ধারণ** (Evaluation)।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) **স্মৃতি-বাচক** (Recall types) ও (২) **জ্ঞানবাচক** (Recognition types)।

স্মৃতিবাচক অভীক্ষা আবার দুই প্রকারের—

(ক) সাধারণ স্মৃতি থেকে উত্তর দান ;

(খ) পদপূরণ।

জ্ঞানবাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলি অধিকতর প্রচলিত, সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) সত্যাসত্য নিরূপণ (Alternative Response) ;

(খ) বহুর মধ্যে একটি নির্বাচন (Multiple Choice) ;

(গ) পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান (Matching)।

জ্ঞানবাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলির প্রচলন কম, সেগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) পুনর্বিন্যাস (Re-arrangement) ;

(খ) পরিচিতি (Identification) ;

(গ) সাদৃশ্যকরণ (Analogy) ;

(ঘ) অসত্য বিবৃতি (Incorrect Statement)।

পরিশিষ্ট

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

অষ্টম শ্রেণী

বঙ্গভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা গদ্য

দুষ্মন্ত ও ভরত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নলিখিত কথাগুলি 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা' যাহা হইবে, তাহা বুঝিয়া ডানদিকে 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা', কিংবা "হ্যাঁ" অথবা "না"র নীচে দাগ দাও :—

১।	দুষ্মন্ত হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন—	হ্যাঁ	না
২।	ভরত কশ্যপের পুত্র—	হ্যাঁ	না
৩।	হেমকূট একটি নদীর নাম—	সত্য	মিথ্যা
৪।	মাতলি দুষ্মন্তের সারথি—	হ্যাঁ	না
৫।	অদিতি কশ্যপের পত্নী—	সত্য	মিথ্যা

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে বামদিকে লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে সাজানো নাই। অর্থগুলির পার্শ্বে সংখ্যা দিয়া নির্দ্ধারিত কর :—

	শব্দ	অর্থ
১।	হেমকূট	মাটির তৈয়ারী
২।	দুর্বৃত্ত	কান
৩।	চক্রবর্তী	দুঃশীল
৪।	শ্রবণেন্দ্রিয়	রাজা
৫।	মৃন্ময়	একটি পর্ব্বতের নাম

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ কর :—

১। এ অরণ্যে — জীবজন্তু — হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর — কাল যাপন করে।

২। তাপসী — ময়ূর আনয়নার্থ — গমন করিলেন।

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ

বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া রহিয়াছে ; যে উত্তরটি ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও :—

১। "বৎস, এত দুর্বৃত্ত হও কেন ?"— কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে ?	১। দুষ্মন্ত, অর্জ্জুন, কশ্যপ, মাতলি, ভরত।
২। "মহাশয় ! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নহে।" (ক) কে, (খ) কাহার প্রতি এই উক্তি করিয়াছে ?	২। দুষ্মন্ত, কশ্যপ, ভরত, দেবরাজ, তাপসী।

পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হইয়াছে, ডানদিকে সেগুলির উত্তর দাও :—

১। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। মহাত্মাটি কে ?	উঃ—
২। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রিয়া কে ?	উঃ—
৩। "ও আপন জননীর নিকট যাউক।" ও কে ?	উঃ—
৪। মহাশয় ! আপনি জানেন না, এ ঋষি-কুমার নহে।—মহাশয় বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে ?	উঃ—

ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ

একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে :—

১। দুষ্মন্ত ও ভরত গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

[**উত্তর**—একমাত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তিই সংসারে আসিয়া পুত্রস্পর্শসুখ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।]

২। দক্ষিণ বাহু স্পন্দনেও রাজা অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই কেন বলিলেন ?

[**উত্তর**—পত্নী শকুন্তলাকে হারাইয়া রাজার মনে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হওয়ায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।]

সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ

বামদিকে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে। যেটি প্রকৃত উত্তর তাহার নীচে চিহ্ন দাও :—

১। 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা' গল্পটির লেখক কে ?	বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত।
২। লেখক কোন্ শতাব্দীর লোক ?	বিংশ শতাব্দী, চতুর্দ্দশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী।
৩। লেখকের জন্মস্থান কি ?	কাঁঠালপাড়া, বীরসিংহ, লণ্ডন, চট্টগ্রাম।
৪। ডানদিকে লিখিত বইগুলির মধ্যে কোন্গুলি তিনি লিখিয়াছেন ?	সীতার বনবাস, কপালকুণ্ডলা, রামায়ণ, শকুন্তলা, পলাশীর যুদ্ধ, পথের পাঁচালী, মেঘনাদবধ কাব্য।

অষ্টম শ্রেণী

বাংলা পদ্য

মা—দেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

ডানদিকে যে সকল শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বামদিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক উত্তর তাহার নীচে চিহ্ন দাও :—

১। কবি কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছেন ?	বৈদ্যনাথ, সিমলা, হরিদ্বার, সীতাকুণ্ড, বৃন্দাবন, দ্বারকা, রামেশ্বর, প্রয়াগ।
২। সর্ব্বতীর্থসার কাহাকে বলা হইয়াছে ?	কাশী, পুরী, জন্মস্থান, কালীঘাট, হরিদ্বার।
৩। গীতগোবিন্দ কি ?	একজন কবি, একটি গ্রন্থ, একটি গায়ক, একটি স্থান।
৪। মুঙ্গের কোথায় অবস্থিত ?	উত্তর প্রদেশে, উড়িষ্যায়, ব্রহ্মদেশে, বিহারে, সিন্ধু-প্রদেশে, সিংহলে।
৫। প্রফুল্ল আশ্রম কোথায় ?	কলিকাতায়, বৃন্দাবনে, উড়িষ্যায়, আসামে।

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য দুইটি উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে ; যেটি ঠিক নয়, তাহা কাটিয়া দাও :—

১। 'মা' বলিতে কবি কাহাকে বুঝাইয়াছেন ?	জননী, জন্মভূমি।
২। জানকী কে ?	সীতা, দময়ন্তী।
৩। রাধাশ্যাম কে ?	এক ব্যক্তি, হিন্দুর উপাস্য দেব।
৪। চিত্ত কোথায় পূর্ণ হয় ?	কাশীতে, জন্মস্থানে।

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে :—

কবির প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু কি ?

[উত্তর—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।]

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ

বামদিকে লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, কিন্তু ক্রমানুসারে সাজানো হয় নাই। সংখ্যা দ্বারা অর্থগুলি ক্রমানুসারে সাজাইয়া দাও :—

১।	চিত্ত	মিলনস্থল	৫।	সর্ব্বতীর্থসার	অন্তঃকরণ
২।	বিন্ধ্য	ব্যাকুল	৬।	সঙ্গম	দেখিয়া
৩।	নিরখিয়া	দেখিলাম	৭।	হেরিলাম	বন্দনা করিলাম
৪।	উতলা	শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান	৮।	বন্দিনু	একটি পর্ব্বতের নাম

ব্যাকরণ

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

সন্ধি—সন্ধিঘটিত যে পদটি ঠিক, তাহার নীচে দাগ দাও :—

যদি + অপি—	যদ্যপি	যদ্যাপি
জন + এক—	জনৈক	জনেক
শিরঃ + ছেদ—	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
দুঃ + অদৃষ্ট—	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
মনঃ + মোহন—	মনমোহন	মনোমোহন

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

পদ-পরিচয়—

"তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলনা দিব।"

এই বাক্য হইতে উদ্ধৃত নিম্নে বামদিকে লিখিত শব্দগুলির কোন্‌টি কোন্ পদ, ডানদিকে লিখিত পদের নামের নীচে চিহ্ন দিয়া দেখাও :—

১।	তুমি—	বিশেষ্য, অব্যয়, সর্ব্বনাম।
২।	ছাড়িয়া—	অব্যয়, ক্রিয়া-বিশেষণ, ক্রিয়া।
৩।	সিংহশিশুকে—	সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষ্য।

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নলিখিত শব্দগুলির নীচে একাদিক্রমে সংখ্যা বসাইয়া বাক্যটি সাজাইলে কিরূপ হইবে, দেখাও। কেবল সংখ্যা বসাইতে হইবে।

বালকের, এস্থানে, ব্যতীত, কহিলেন, কিন্তু, ঋষিকুমার, দেখিয়াই, রাজা, আকার, সম্ভাবনা, বোধ, অন্তবিধ, প্রকার, নয়, সমাগম, হইতেছে, ঋষিকুমার, বালকের, নাই।

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নলিখিত শব্দগুলির কোন্‌টি কোন্ বিভক্তিযুক্ত, সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ কর :—

তপস্বীদিগের	আমা হ'তে
রাজাকে	তোরা
আশ্রমে	সবাইকে দিয়া
তোমায়	সবের মাঝে

পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ

কারক—

নীচে বামদিকে লিখিত বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরের পদগুলি কোন্ কারকে হইয়াছে, তাহা ডানদিকে লিখিত কারকগুলির যেটি হইবে তাহাতে চিহ্ন দাও :—

১। রাজা **রথ হইতে** অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—	কর্ত্তা, সম্প্রদান, অপাদান।
২। এমন **স্থানে** কে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে?—	কর্ত্তা, অধিকরণ, করণ।
৩। **যাহার**[১] পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার **গাত্র**[২] স্পর্শ করিয়া কি অনুপম **সুখ**[৩] অনুভব করে, তাহা বলা যায় না—	সম্প্রদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ পদ, কর্ম্ম, অপাদান।
৪। তাই, মা, তোমার পাশে এসেছি আবার—	কর্ত্তা, অধিকরণ, সম্বন্ধ পদ, কর্ম্ম।

ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ

সমাস—

বামদিকের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলি যে সমাসের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ডানদিকে লিখিত সমাসের নাম হইতে একটি চিহ্নিত করিয়া দেখাও :—

১।	এই **মহাত্মার** নাম শুনিয়াছি—	কর্মধারয়, বহুব্রীহি, দ্বিগু।
২।	শিশু **সিংহ-শিশুর** কেশ আকর্ষণ করিতেছে—	দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব।
৩।	**রাধাশ্যামে** নিরখিয়া করিলাম কত নৃত্য—	কর্মধারয়, অব্যয়ীভাব, দ্বন্দ্ব।
৪।	করিলাম **পুণ্যস্নান** ত্রিবেণী-সঙ্গমে—	দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি।

সপ্তম শ্রেণী

বিষয়—বাংলা কবিতা—'প্রার্থনাতীত দান'

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ করিয়া দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। নির্দ্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে এবং উত্তর দিবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের সহিত নমুনা দেওয়া আছে।

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে। তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে। যে শব্দটি ঠিক বলিয়া মনে হইবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে। মনে রাখিবে যে, একটিমাত্র শব্দের নীচে দাগ দিতে হইবে।

নমুনা—বিদ্যালয়ে কোন্ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখেন ?

শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী, ইতিহাস-শিক্ষয়িত্রী, ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী।

এখানে প্রশ্নটিতে ছাত্রীর সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখার কথা আছে ; কাজেই "শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী" শব্দটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে। অতএব "শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী" শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হইল।

প্রশ্ন (১) বেণী রাখা কোন্ জাতির ধর্ম্মের অঙ্গ ?

রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজী।

(২) মোগলদিগের ঠিক পূর্ব্বে কোন্ মুসলমান রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করিত ?

আরবদেশীয় মুসলমান, পাঠান, তুর্কী, কাবুলদেশীয় মুসলমান।

(৩) শুহিদগঞ্জ কোথায় অবস্থিত ?

বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা।

(৪) 'রক্তবর্ণ' শব্দটিকে গদ্যে কি বলে ?

রক্তচিহ্নিত, রক্তবর্ণ, রক্তাক্ত।

(৫) ধরণীতল বলিতে কি বুঝ ?

মাটির নীচে, পৃথিবী, আকাশের নীচে।

(৬) অবহেলা শব্দটি কোন্ শব্দ দ্বারা বুঝানো যায় ?

অপমান করা, তুচ্ছ করা, সম্মান দেখানো।

(৭) শিখধর্ম্মের চিহ্ন কি ?

পাগড়ী, পঞ্চককার, পোষাক।

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে। শূন্য স্থানগুলিতে এরূপ শব্দ বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়।

নমুনা—পাখী কলরব করে।

সম্ভাব্য উত্তর—সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, প্রভাতে।

এখানে কলরবের কথা বলা আছে; সুতরাং যে সময়ে পাখীরা কলরব করে তাহা 'প্রভাত কাল'। অতএব শূন্য স্থানে 'প্রভাতে' কথাটি বসিবে।

প্রশ্ন (১) বন্দীকে — আনা হয় ?

উঃ—সসম্মানে, বাঁধিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে, বন্ধুর মত।

(২) শিখের পক্ষে — ধর্ম্মত্যাগের ন্যায় দূষণীয়।

উঃ—ক্রোধ প্রকাশ করা, বেণী ছেদন, হাসিয়া কথা বলা।

(৩) নবাব কহিলেন, আমি তোমার উপরে ক্রোধ করিব না কারণ তুমি —
উঃ—আমার শত্রু, বিধর্ম্মী, মহাবীর।

(৪) শিখদের রক্তে মুদ্‌কির ভূমি — হইয়া উঠিল।
উঃ—কঠিন, রক্তরাঙা, অনুর্ব্বর।

(৫) তরুসিংহ কহিল, ক্ষমা করিতে চাহিয়া তুমি আমাকে — করিতেছ।
উঃ—খুশি, অপমান, দুঃখী।

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। এই শব্দগুলির ডানদিকে অনুরূপভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং ডানদিকের শব্দগুলির পার্শ্বে "( )" চিহ্নিত স্থান আছে। বামদিকের যে শব্দটির সহিত ডানদিকের যে শব্দটি অর্থ-সম্পর্কযুক্ত হইবে, ডানদিকের শব্দটির পার্শ্বের শূন্যস্থানে বামদিকের শব্দটির ক্রমিক নম্বরটিমাত্র বসাইয়া দিবে।

নমুনা :—(১) বঙ্গদেশ কটক ( )
(২) উড়িষ্যা কলিকাতা ( )

বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা এবং উড়িষ্যার রাজধানী কটক; সুতরাং বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং উড়িষ্যা ও কটক 'দেশ' এবং 'রাজধানী' সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং কলিকাতার পার্শ্বে "( )" চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্যা (১) এবং কটক শব্দটির পার্শ্বে "( )" চিহ্নিত স্থানে উড়িষ্যার ক্রমিক সংখ্যা (২) বসাইতে হইবে। অতএব পূর্ণ ঈপ্সিত উত্তর হইবে কলিকাতা (১), কটক (২)।

(১) জমিতে গাঁথিয়া রহিল ( )
(২) অবহেলা ক্ষমা করিতে ( )
(৩) না করি ক্রোধ তুচ্ছ করা ( )
(৪) গাঁথা রাগ ( )
(৫) বরণ মনে ( )
(৬) ধরণীতল বিনতি ( )
(৭) অনুরোধ পৃথিবী ( )
(৮) হৃদয়ে বর্ণ ( )